কলরব

তাহারা মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তই তাহাদের নাম। অভাব, আনন্দ এ পরমায়ু তাহাদের সামান্য। আত্ম-অপমানকে ঢাকিতে গিয়া তারা আপন আপন দৈন্যকে প্রকাশ করে। আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া চলা তাহাদের জীবনের কঠিনতম সমস্যা। তাহাদের না মধ্যবিত্ত।

*

*   *

কোনো একটি পল্লীর যবনিকা যখন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল তখন দেখা গেল পাত্র-পাত্রীরা চির-পরিচিত। আগেকার মতই ছোটখাটো বাধা-বিপত্তিতে ঘা খাইতে খাইতে তাহাদের বিচিত্র জীবন-স্রোত একটানা সুরে তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে। বৃহৎ পৃথিবী কোনোদিনই তাহাদের কাছে কোনো সংবাদ বহন করিয়া আনে না।

এ পাড়ায় আগে যাহারা ছিল এখনও তাহারা আছে। যাহারা নাই তাহারা ভাড়াটে, এক জায়গায় স্থায়ী হইয়া তাহারা থাকিতে পায় না, বাড়ী বদল করিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেছে। তাহাদের শূন্য স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে এখন অন্য লোক।

নবীনবাবুরা নূতন এ পাড়ায় আসিয়াছেন; চাটুয্যেদের তিনটি ঘর ভাড়া লইয়াছেন পঁচিশ টাকায়। বাইশ টাকায় পাইবার

জন্য ঝুলোঝুলি কিন্তু চাটুয্যে মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া দিয়া বলিয়া ছিলেন, দিতে পারি মশাই, বাইশ টাকায় ; তবে ওই যা বললা শোবার ঘরের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করে' নিতে হবে।

নবীনবাবু তাহাতেই রাজি হইয়া আসিয়াছেন।

জীবন চৌধুরীর বাড়ীটি এই অভিনয়ের কেন্দ্রস্থল হইতে কয়েক গজ দূরে। তাঁহারই বাড়ীর পিছন দিকের একখানি ঘরে সম্প্র একটি অল্পবয়স্কা মহিলা ভাড়াটে আসিয়াছেন। মহিলাটি অত্য সংযতবাক এবং গম্ভীর। বড়রাস্তার উপরে কোথাও কর্পোরেশনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি নিয়মিত পড়াইতে যান্। ছুটির দিনে তাঁহার দরজায় সকল সময়েই তালা বন্ধ থাকে। তাঁহার মুখে আজ পর্য্যন্ত কেহ হাসির রেখা দেখে নাই। নিকটে অনন্ত-মুদির দোকানে মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইয়া জটলা বসে।

এ পাড়ায় সর্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নূতন একতলা বাড়ীটির সুমুখের দুইখানি ঘর। নূতন বাড়ী এদিকে মাত্র এই একটি। এই ঘর দুইটিতে সেদিন হঠাৎ দুইটি স্বামী-স্ত্রী কোথা হইতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। চির-নূতনের বেশে চির-পুরাতনের লীলা সেই হইতে সুরু হইয়াছে।

স্বামীর নাম সীতেশ, স্ত্রীর নাম দামিনী।

এদিকে যাহারা থাকে তাহাদের নাকি চালের আড়ৎ আছে। কারবারি লোক বলিয়া দুপুর আর রাত্রি ছাড়া তাহাদের বড়

একটা সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পাশের বাড়ীর নিচের তলাটায় দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া থাকেন এক কবিরাজ। এইটুকু পাড়ার মধ্যে তাঁহার পসার নিতান্ত মন্দ নয়। শোনা যায়, দুই বৎসর পরে পেটের অসুখ হইবে কি না তাহা তিনি নাড়ি দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন। ওদিকে থাকেন উকীল গোকুল বোস। ভারি শাসাসিধে লোক। তাঁহার বাড়ীতে কোনদিন মক্কেল আসে না, তিনিই মক্কেল বাড়ীতে যান্। কোর্টে বাহির হইবার সময় প্রতিদিন তিনি সেই শাদা সুতোয় সেলাই-করা রঙচটা কালো চাপকানটি মার দুই পায়ের গোড়ালি-ছেঁড়া মোজা জোড়াটি পরিয়া যান্। এ াড়ার ছেলেরা বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে এই বিশেষ পোষাকটি রিতে দেখিয়া আসিতেছে। দশটার সময় পথে তিনি বাহির ইলেই ছেলেরা পিছন দিক হইতে তাঁহাকে কি একটা নামে াকিয়া ছুটিয়া পালায়।

সুমুখের বাড়ীর দোতালার জানালা হইতে একটি অল্পবয়স্ক ক ইহাদের এই দুরন্তপনার দিকে চাহিয়া থাকে। এমন করিয়া ইয়া থাকাই তাহার অভ্যাস। মাঝে মাঝে দেখা যায় জানালার াদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দূর শহরের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নারিকেল ার দিকে সে তাকাইয়া রহিয়াছে। ছেলেটির নাম শঙ্কর। ার বাড়ীতে থাকিয়া সে লেখাপড়া করে। এবার সে একটি শ' করিয়াছে।

কলরব

নবীনবাবুদের বাড়ীর গোলমালটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহার কানে আসিয়া বাজে। নিত্যদিনের দারিদ্র্য বাড়ীটিকে দিবারাত্র যেন বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

একটি অসহায় গৃহবধূর কাতরকণ্ঠ শোনা যাইতেছিল। এই সংসারকে কাঁধে করিয়া চলিতে চলিতে দিনের পর দিন সে মেয়েটি যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'—আমি তা কি করব? টেনে-বুনে চালাই দেখতে পাও না? ভাতে নুন জোটাতে পারো না, সে কি আমার দোষ?'

কয়লাওয়ালা তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাগাদা করিয়া যায়, মুদি আসিয়া গালাগাল দেয়, গোয়ালা দরজায় দাঁড়াইয়া বিদ্রূপ করে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। ইহার উপর স্বামীর নিকট হইতে অকথ্য কথাও শুনিতে হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বৌটির উদাস দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

আবার হয়ত একসময় অত্যাচার সহিয়া সহিয়া মৃদু প্রতিবাদ করে। কাঁদিয়া বলে, মরণ হলেই বাঁচি। ভগবান, তুমি কি নেই?

ভগবান কোনো জবাব দেন্ না।

দুপুর বেলায় মেয়েদের কোলাহলকে এড়াইবার উপায় শঙ্করের

নাই। তাহার ঘরের গায়েই আশপাশের কতকগুলা ছাদে মেয়েদের অবিশ্রান্ত আলাপ চলিতে থাকে।

'—কি অলক্ষুণে বৌ মা, এমন আর কোথাও দেখি নি বাছা। শাঁখ বাজিয়ে বৌ ঘরে তুললে, শানাই বাজনা এখনও থামে নি, পাঁচ বছরের ছেলেটা অমনি ধড়ফড়িয়ে গেল, কব্‌রেজ ডাক্‌বারও সময় পেলে না।'

'আর মা, বলে, মরণের ধরণ নেই! মা মাগী পাপ করেছিল; ছেলেটারো ছিল ভোগ। ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদলে কি আর ফিরে চাইবে? আহা, ওই একটিই ছেলে। সাত রাজার ধন।' বলিতে বলিতে টুনির মা নিজের মেয়েটাকে আঁচলের আড়ালে ঢাকিয়া চলিয়া যায়।

'কি শুন্‌চি লা? খোকা হয়েছে? আহা, তা বেশ বেশ। পের্‌থম্ মেয়ে হয়েছিল বিউনির বাঁধন। এবারে হল' ছেলে, আহা, মাক্কণ্ডের পেরমাই নিয়ে—'

'ছেলে খুব ফুট্‌ফুটে হয়েছে কাকিমা!'

'তা আর হবে না বাছা? মা-বাপ খুব সোন্দর যে! নাম কি রাখা হল'?'

'নাম এখনো রাখা হয় নি। কাল হবে আটকৌড়ে।'

'রাশ নাম?'

'চঞ্চলকুমার।'

'হাঁড়িটা নামাতে পারিস নে পনেরো বছরের ধিঙ্গি মেয়ে? ভাতগুলো সব ধরে' পুড়ে গেল, পিণ্ডি গিল্‌তে হবে না? সোয়ামির ঘর পুড়িয়ে বাপের গলায় রয়েচিস, চাল ডালের ওপর এতটুকু দরদ নেই?'

গালাগালি খাইয়া মেয়েটি শব্দ করিয়া হাসিতে থাকে। বলে, 'আগুনে পুড়চে দেখতে আমার বেশ লাগে। তোমরাও পুড়ে মর না?'

আবার গালিবর্ষণ চলিতে থাকে।

তা চলুক, তবু এগুলি সবই ছোট ছোট। ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট হাসি-কান্না, ছোট ব্যথা-বেদনা—ছোট আয়তনের মধ্যে ইহারা সবাই জীবনের সঙ্গে কিছু একটা আপোষ করিয়া লইয়াছে। এখানকার সীমানার বাহিরে সমস্তই অন্ধকার। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই পৃথিবী আপনার ডানা গুটাইয়া চিরকালের জন্য বন্দী হইয়া আছে। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে।

নিত্যদিন সন্ধ্যার পর আপিস হইতে ফিরিয়া হাঁপানিগ্রস্ত রোহিণীবাবু কাসিতে সুরু করিয়া দেন্ অনেক রাত অবধি। একটানা একঘেয়ে সেই কাসির শব্দ অন্ধকারকে বিদ্ধ করিয়া আশপাশের সমস্ত বাড়ীগুলিকে সজাগ করিয়া তুলে। সে শব্দ শঙ্করের কান দুইটাকে যন্ত্রণায় যেন অধীর করিয়া দেয়। ও-বাড়ীর সেই বিপত্নীক গোঁয়ার লোকটা ছোট ছেলেটিকে পড়াইবার নাম করিয়া

বেদম ঠেঙাইতে থাকে। গোকুল বোসের স্ত্রীর এক একটি করিয়া গহনা বন্ধক পড়িতেছে, তাঁহার বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না আর থামিতেই চায় না। বলেন, 'ভগবান না করুন···যদি তোমার ভদ্রা-ভদ্দর ঘটে তা হলে ····তুমিই বল না, ছ'টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে—'

গোকুলবাবু বলেন, 'এবার হব সন্ন্যিসি, হরি হরি বল।'

এদিকে বাড়ীটায় এক মদ্যপায়ী স্বামী তরুণী স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে মহা সন্দিহান হইয়া যাহা বলিতে থাকে তাহা স্পষ্ট শঙ্করের কানে আসিয়া বাজে। জড়াইয়া জড়াইয়া বলে, 'জানি সবই জানি। দ্রৌপদীকেও জানি, সীতাকেও জানি, আবার তোমাকে বুঝতেও বাকি নেই। খড়দা আর এঁড়েদার মাঝখানে আগড়-পাড়াটা না থা কলেই তোমার সুবিধে হতো···কি বল?'

বৌটি হয় ত করুণার হাসি হাসে। বলে, 'আচ্ছা হয়েছে, ঘুমোও দেখি এখন চুপটি করে'? বাঁচি তা হলে, ঘুমোও।'

'ঘুমোবো? কেন বল ত? ঘুমোলেই ত তুমি কাজ গুছোবে। মাইরি ঘুমোবো না। তোমার দিব্যি, না। হিসেব করে' দেখো, তিরিশ বছরের মধ্যে দশ বছর—এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি—'

কিয়ৎক্ষণ পরে আর তাহাদের কথা-বার্ত্তা শোনা যায় না।

জানালার কাছে শঙ্কর আসিয়া দাঁড়ায়। চারিদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার, শুধু সুমুখের বাড়ীর উপরের ঘরের খড়খড়ির ফাঁক দিয়া

চক্‌চকে আলোর রে া দেখা যায়। বিবাহের উৎসব ওখানে কয়েকদিন আগে শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার আবহাওয়া আজও ভুর ভুর করিতেছে। নব পরিণীতা বধূর চোখে রঙের ঘোর বোধ করি এখনও কাটে নাই। সে চোখে হয় ত এখনও স্বপ্ন লাগিয়া আছে, কালো কালো চুলে আছে মৃদু মৃদু তেলের গন্ধ। আজ তাহাদের নব বসন্তোৎসব। কিন্তু তাহারই পাশে পত্রহীন আমগাছটার নীচে একতলা বাড়ীটি হইতে গিন্নীর কান্নার আওয়াজ শঙ্করের কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। বাপের বাড়ী হইতে তাঁহার চিঠি আসিয়াছে, ভাইটি আর ইহজগতে নাই। একটিমাত্র ভাই, তাহারই শোক।

জানালার কাছ হইতে নিঃশব্দে শঙ্কর সরিয়া যায়। নিরন্ধ্র রাত্রি তাহার কাছে যেন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। চোখে তাহার ঘুম নাই। একাকী ঘরের মধ্যে মনে হয় বহু মা া তাহার আশেপাশে চারিদিকে যেন ভিড় করিয়া জটলা া াইতেছে। সে যেন মাটির বিধাতা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সমস্ত কামনা যেন উর্দ্ধায়িত হইয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রালস দুইটি চোখে আলোর দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। জীবন-মরণের এই লীলার মাঝখানে বন্দী হইয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে।

কলরব

*

*   *

শীতকালের মাঝামাঝি। তেতলার আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরখানিতে সকাল হইতে ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। চারিদিকে তাঁহার বিশৃঙ্খল গৃহ-সরঞ্জাম, মেঝের উপর হরেক রকমের কাগজপত্র ছড়ানো, বিছানাগুলি অগোছালো, ময়লা ও ফর্সা একরাশি তালপাকানো জামা-কাপড়—দেখিলে মনে হয়, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও গৃহস্বামী সেগুলির সুবিন্যাস করিতে পারেন নাই।

বয়স তাঁহার ত্রিশের কাছাকাছি। দাড়ি গোঁফ নাই বটে কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার মাথার চুল অনেকটা শাদা হইয়া আসিয়াছে। কপালে চার পাঁচটি রেখা। চোখ দুইটি তীক্ষ্ণ, কিন্তু চঞ্চল নয়,—মুখখানা গম্ভীর। সে মুখে হাসিও নাই, বিষণ্ণতাও নাই।

অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া একটি ছোট কাঠের বাক্স পাড়িয়া লইলেন। সেটি খুলিবার পর দেখা গেল তাহার মধ্যে সবগুলিই হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশি। বাক্সটি হাতে করিয়া জুতাটি পায়ে দিয়া ঘরখানি খোলা রাখিয়াই তিনি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

'—এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন ভেতরে আসুন।—না না,

চৌকিতে নয়, ওই চেয়ারটায়—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আজ খুব সকাল সকাল উঠেছেন দেখছি ?'

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু বাক্সটি ধীরে ধীরে খুলিলেন।

'হ্যাঁ, ভাল আমি বিশেষ নেই, বুঝলেন ডাক্তারবাবু ? কালকের চেয়ে হাত-পাগুলো আজ বেশী শাদা দেখাচ্ছে, আপনারো তাই মনে হচ্ছে না কি ?'

ডাক্তার মুখ তুলিলেন।

'এই দেখুন না, গায়ের ওপর টিপ্‌লে আঙুল বসে' যাচ্ছে। কি আর করি বলুন, সবার অবস্থাই ত সমান, ওষুধপত্রের জন্য আপনি টাকাকড়ি কিছু নেন্ না তাই জন্যেই ত—আচ্ছা ডাক্তার-বাবু, এ রোগ সারে ত ?'

ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া ঔষধ বাহির করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া ঘাড় তিনি বরাবরই নাড়েন, অতএব এ রোগ সারে কিম্বা সারে না তাহা তাঁহার মস্তক-সঞ্চালন দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। একটি এনামেলের বাটিতে কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া দিয়া শিশিটি আবার বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিলেন।

দরজার কাছ দিয়া একটি যুবক পার হইয়া যাইতেছিল, ডাক্তারকে দেখিয়াই সে ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, "নমস্কার ডাক্তারবাবু, ওপরেই যাচ্ছিলাম আপনার কাছে।'

'আবার কি হ'ল ?'—ডাক্তারবাবু বলিলেন।

'হাঁপানির টানটা বাবার কাল থেকে আবার বেড়ে গেছে।'

'ও, তা চলুন, একবার দেখে আসা যাক্।'

ঘরের বাহিরে আসিয়া বাঁরান্দা পার হইয়া যুবকটির পিছনে পিছনে তিনি আর একটি ঘরে ঢুকিলেন। রোগী প্রৌঢ়, অস্থিসার দেহ, রোগপাণ্ডুর বিবর্ণ চেহারা—বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস টানিতেছে।

নাড়িয়া চাড়িয়া ডাক্তার তাহাকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তারপর পিছন দিকে চাহিয়া যুবকটিকে বলিলেন, 'আমার ওষুধে ভাল হবার সম্ভাবনা এঁর আর নেই, আপনারা বরং—'

ঘরখানির মধ্যে চারিদিকে কঠোর দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল, যুবকটি একবার সকল দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, 'তাই ত, তা হলে কি করা যায় বলুন ত ডাক্তারবাবু? ওষুধ আর আপনি দেবেন না।

বোবার মত ছেলেটি উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বাছিয়া বাছিয়া কি একটা ঔষধ বাহির করিয়া তাহার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ডাক্তার আবার বাহির হইয়া গেলেন। কোনো সহানুভূতি কিম্বা কোনরূপ সান্ত্বনার কথা তাঁহার মুখে আসিল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া তিনি নামিয়া আসিলেন।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া যাহারা চেঁচামেচি করিতেছিল তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া থামিল না, বলিতে লাগিল, 'বাড়ীওলার কথা বলচেন, শালা কঞ্জুসের একশেষ। ভাড়াটের কোনো খবরই রাখে না। দর্মাহাটায় না কোথায় থাকে মশাই, পাটের দালালি করে, মাসকাবারে আসে, গলায় গামছা দিয়ে ব্যাটা টাকা নিয়ে যায়।'

'আমরা ত নতুন এলাম, সবশুদ্ধ ক' ঘর ভাড়াটে জম্‌লো বলুন ত? বাড়ীটা ত তেতলা দেখতে পাই।'

'হ্যাঁ, তেতলা, তা ছাড়া ঘরগুলোও—এই ত ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন, আপনার মেয়েটিকে একবার দেখিয়ে দিন্ না, চোখ নিয়ে অত ভুগছে।'

'তা হলে ত ভালই হয়। নমস্কার ডাক্তারবাবু, যদি দয়া করে' একবার দেখে যান্ আমার মেয়েটিকে। চোখে যে তার কি হল' কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

নমস্কার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার ভদ্রলোকটির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নীচেকার একটি অপরিসর ও অস্বাস্থ্যকর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জানালার দিকে মুখ করিয়া বিছানার উপর একটি তরুণী বসিয়াছিল, লোকটি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'টুলু, উঠে দাঁড়াও ত মা একবার, ডাক্তারবাবু তোমার চোখ দেখবেন। কি

হ'ল মশাই দেখুন ত, জ্বালা করচে, যন্ত্রণা হচ্চে, রস গড়াচ্চে. চোখে আর ভালো দেখতে পাচ্চে না। এত বড় মেয়ের চোখে যদি এমন হয়—দেখচেন ত বিয়ের যুগ্যি মেয়ে—'

মেয়েটির মাথা হাতের মধ্যে লইয়া ডাক্তার তাহার চোখ দুইটি টানিয়া টানিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সময় বলিলেন, 'যে অন্ধকার, সহজে কিছুই বোঝা যায় না।'

'আর অন্ধকার,এই দুটির ভাড়াই পনেরো টাকা ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারের কানে সে কথা গেল কি না কে জানে, মেয়েটির মাথা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তবে এ বিশেষ কিছু নয়, ভাল হয়ে যাবে। চোখে কিছু পড়েছিল তার থেকেই—'

'তাই বলুন ডাক্তারবাবু, শুনে বাঁচি।' ভদ্রলোকের চোখ অন্ধকারে বোধ হয় সজল হইয়া আসিল, 'সাম্‌নের জ্যষ্ঠিমাসে বিয়ে দেবো ঠিক করলাম কিন্তু এসব দেখে শুনে ডাক্তারবাবু—'

নিষ্প্রয়োজনের কোনো কথা ডাক্তারের মুখে আসে না। বাক্সটি খুলিয়া আপাতত একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নয়টা বাজিয়া গেল, স্নান করিবার সময় হইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু গতিতে উপরে উঠিতেছিলেন। একটি লোক এতক্ষণ ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শুক্‌নো তোবড়ানো একখানি ছোট মুখে একমুখ দাড়ি গোঁফ ; রোগা, লম্বা, বয়স

পঞ্চাশ হইতে ষাটের দিকে নিশ্চিন্ত গড়াইয়া গিয়াছে। গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত একগোছা শাদা পৈতা ঝুলিতেছে। সিঁড়ি দিয়া ডাক্তারকে উঠিতে দেখিয়াই পিছন হইতে ডাকিল, 'বাবাজি ?'

ডাক্তার ফিরিয়া তাকাইলেন।

দারোয়ানি ঢঙে কপালে হাত ঠুকিয়া লোকটি বলিল, 'আমি তোমার মামা হই বাবাজি। হে হে—'

'কি চান্ ?'

'একটি টাকা ; আফিং আর দুধ ; তামাকের পয়সা আর একজন দেয়। আমি নীচেই থাকি বাবাজি, হে হে—'

ডাক্তার পকেটে হাত ঢুকাইয়া একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলিল, 'চল্‌বে ত বাবাজি ?' বলিতে বলিতে আঙুলের উপর টাকাটি রাখিয়া টোক্কা মারিয়া একবার টুং করিয়া নাচাইয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল, 'হাঁ ঠিক হ্যায় ! হে হে, বুল্‌বুলি রে !'

টাকাটির উপর একটি প্রগাঢ় চুম্বন বসাইয়া ডাক্তারকে আর একটি সেলাম করিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

ডাক্তারও উপরে উঠিয়া আসিলেন।

স্নানের পর আহার করিতে হয় বাজারের কোনো হোটেলে গিয়া। হোটেল হইতে বাহির হইয়া সোজা তিনি যখন আপিসে গিয়া পৌঁছান্ তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। বই-খাতা,

এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিয়া খানিকটা সময় কাটে। বারোটার পর হইতে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেমন একটি অস্বাভাবিক আলস্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরে। সে আলস্য মন্থর, কিন্তু অস্বস্তিকর। তাহার মধ্যে এলায়িত আরামের তৃপ্তি নাই, বরং সর্ব্বাঙ্গে একটি অশান্তির কাঁটা ফুটিতে থাকে।

গোধূলি বেলায় সূর্য্যাস্তের বিপরীত পথে ধাবমান অন্ধকারের দিকে গরু যেমন শ্রান্ত দেহে ফিরে, আপিস হইতে বাহির হইয়া তিনিও বাসার পথ ধরেন। চেহারার মধ্যে তাঁহার ক্লান্তিও যেমন প্রচুর, ধৈর্য্যও তেমনি অসাধারণ।

ঘরে ঢুকিতে সন্ধ্যা হয়। নীচে হইতে তেতলা পর্য্যন্ত উঠিতে গিয়া গোটা পাঁচেক বিরক্তিকর নমস্কার প্রতিদিন তাঁহার প্রতি আসে। কোনোদিনই সেদিকে তাকাইবার মতো অভিরুচি তাঁহার থাকে না, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া আলোটি জ্বালিয়া তিনি তক্তাটার উপর বসিয়া পড়েন। নীচের তলাকার গোলমাল কানে আসিতে থাকে। পাশাপাশি দুইটি গৃহস্থের ঠোকাঠুকি সকল সময় যেন লাগিয়াই আছে। সামান্য কলের জল লইয়া বিবাদ। সামান্যর জন্য বিবাদ করাই ইহাদের প্রকৃতি।

বিবাদ যদি বা থামিল, একটি লোকের গলাবাজি আর থামিতে চায় না। খুব সম্ভবত আপন কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া লোকটি তিরস্কার করিতে থাকে।

কলরব

'ছাতে উঠ্‌বি নে খবরদার কাল থেকে বলে' দিচ্ছি, বারান্দায় দাঁড়াবি নে, জান্‌লায় বসে' রাস্তার দিকে তাকাবি নে। মেয়েছেলের বই পড়া কি আবার ? দশটা পাঁচটা খাটতে যাবি নাকি ? ওসব চল্‌বে না বলে' রাখলাম ; আমার ভাত খেতে গেলে বেয়াদপিটা ছাড়তে হবে। লজ্জা করে না, পান খেয়ে আল্‌তা পরে' জান্‌লায় দাঁড়াতে সরম হয় না ?'

'চুপ কর গো চুপ কর, বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে ওসব কথা— একটু রেখে ঢেকে···'

'তা হোক, অনেয্য কথাটা কি বল্‌ছি ?'

দোতলার কোণের ঘরখানিতে একটি বৃদ্ধা মাতা তাঁহার বিধবা কন্যাটিকে লইয়া থাকেন। কয়েকদিন আগে তাঁহার কন্যাটির মাথার দোষ ঘটিয়াছে। মেয়েটি হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, চীৎকার করিতেছে, সময় সময় আবার গানও ধরিতেছে। বৃদ্ধাটি যেমন অসহায় তেমনি বিপদগ্রস্ত। ডাক্তারের ঔষধে কোনো ফল হয় নাই।

খানকয়েক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিলাতী মাসিকপত্র একপাশে জড়ো করা ছিল, তাহাদের ভিতর হইতে একখানি টানিয়া লইয়া ডাক্তার উল্‌টাইতে লাগিলেন। উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে খানিকক্ষণ পরে আবার মুখ তুলিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

কলরব

চারিদিকের গোলমালের পাশে কখন্ নিঃশব্দে রাত ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

দরজার পাশে যেন খস খস করিয়া কাহার পায়ের শব্দ হইল। ডাক্তার মুখ ফিরাইলেন। আলোটা বাহিরে পড়িয়াছিল, তাহাতেই বোঝা গেল, কে একজন দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আলোটা হাতে লইয়া ডাক্তার উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কে?'

নীচেকার একটি বউ। কিন্তু বউটি কথা কহিল না, বাঁ-হাতের মুঠা হইতে একটি পাকানো কাগজের গুলি ডাক্তারের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার সেটি তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া বড় করিয়া আলোর মুখে ধরিয়া পড়িলেন—

'ডাক্তারবাবু,

আমি এ বাড়ীর বৌ না হইলে আপনার সহিত কথা বলিতাম। আপনার দয়া ভুলিবার নয়। আপনি মহৎ, উদার, আপনার মত লোক আজকাল দেখা যায় না। আপনার ঋণ শোধ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। আপনার দয়ায় এ যাত্রা আমার বড় ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল। প্রার্থনা করি আপনি রাজা হোন।

যদি আর একটি উপকার করেন তা হলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। মাসের শেষ হওয়ায় আমাদের প্রায় হাঁড়ি চড়া বন্ধ হইয়াছে। দয়া করিয়া দুইটি টাকা ধার দিবেন কি?—ইতি।'

নীচে নাম সই নাই।

টাকা দুইটি হাতের উপর তুলিয়া দিবার আগে মেয়েটির সমস্ত চেহারাটার প্রতি ডাক্তারের একবার নজর পড়িল। উপবাসী, শ্রীহীন, শীর্ণ দেহ, শিরাবহুল দুইখানি হাত, বকের মতো সরু সরু দুইখানা পা। টাকা দুইটি হাতে পাইয়া এক মুহূর্ত্ত সে আর দাঁড়াইল না; দুইখানি বাঁকারির উপর ভর দিয়া সেই মলিন বস্ত্রাবৃত কঙ্কালখানি নিমেষে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ছাদের উপর আসিয়া ডাক্তার পায়চারি করিতে সুরু করিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে এই পায়চারি করাটা তাঁহার অতিরিক্ত বাড়িয়া যায়। নক্ষত্রখচিত দূর গগনের অসীম অন্ধকারের একপ্রান্তে শীর্ণ চাঁদটুকু তখন হেলিয়া পড়িয়াছে। দূরে কোথায় ট্রেণের বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাইতেছিল।

*

*　　*

মুখোমুখি দুইটি বাড়ীর [illegible] আলাপ চলিতেছিল। রাঙাদিদি বলিতেছিলেন, 'কি জানি মা, এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল তার কোন হদিস পেলাম না।'

'তা ব'লে বউ মানুষকে এমন করে' মারতে নেই, তা তোমরা যাই বল বাছা।'

'কি জানো মা, এমন অনেক কারণ আছে, যার জন্যে খুন করলেও রাগ যায় না। কি জন্যে মারল তা কি আমরা কেউ জানি ?'

'মন যুগিয়ে চলে নি হয় ত।'

'তা আবার চলে নি! এদিকে স্বামী বলতে অজ্ঞান। জান্‌লার ঝিলিমিলি দিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, মন যোগাবার জন্যে কতদিন সোয়ামির সঙ্গে বেশ্যেগিরি করতে।'

'অত বাড়াবাড়ি করলে এমনিই হয় গা।'

'দোষের মধ্যে দোষ, মিথ্যে কথার ঝুড়ি। দেবতা-বামুনে ভক্তিও তেমন নেই শুনেছি, সেদিন ঠাকুর-ঘর থেকে কলা চুরি করে' খেয়েছিল বলে' শাউড়ী বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল।'

'কি করবে বল, বেলা তিনটে অবধি উপোস করিয়ে রাখবে, মানুষের শরীর ত!'

'তা বলি মারলে কেন গা এমন করে' ?'

'কি জানি মা, ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' আগে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে' জিজ্ঞেস করলে, বৌটা বোধ হয় কথার কোন জবাব দিলে না···হতে হতে মা দুম্‌দাম শব্দ, তারপরই বৌটার সে কী চেঁচানি; তোমায় বল্‌ব কি রাঙাদি,—আহা ছুঁড়ির কাৎরানি শুনে চোখে জল এলো···মাগো!'

'কি শুন্‌লি তারপর ?'

'সবাই চুপ চাপ, কারো মুখে রা নেই। জিজ্ঞেস করতে গেলে মুখ ফিরিয়ে চলে' যায়।'

রাঙাদিদি একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, একবার চোখ বুজিলেন, গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টির ভাণ করিয়া একবার ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বুঝেছি।'

'কি রাঙাদি ?'

রাঙাদিদির বয়স ষাটের কাছাকাছি আসিয়াছিল। খুব সম্ভবত বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়াই কহিলেন, 'পাঁচ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েমানুষকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করি নে ভাই।' বলিয়া তিনি সম্রাজ্ঞীর মতো প্রস্থান করিলেন।

ছোটপিসিমা এতক্ষণ আমল পান্ নাই। রাঙাদিদি চলিয়া যাইবার পর তিনি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া এবার নিজের একটুখানি বাহাদুরি প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইলেন।

'কামড় দিতে হয় কেমন করে' তা আমি জানি, বুঝলে নতুনবৌ ?'

নতুনবৌ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

'আমি আন্‌লাম ভাই পাত্তর খুঁজে সাত দেশ এক করে', আর তুমি গছালে তোমার মেয়েটিকে। মেয়ের রূপ দেখিয়ে পাত্তরকে তুমি দিলে আগাগোড়া ফাঁকি।'

'তা কপাল ত পুড়লো পিসিমা, তুমি গিয়ে তাদের কাছে মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে' এলে।'

ছোটপিসিমা মেয়েদের সুমুখে এই অপমানকর কটাক্ষ শুনিয়াও দমিলেন না। বলিলেন, 'তোমার মা এক কথা। এ ধর্ম্মের সংসার। যা সত্যি তা ছেলেমেয়ের মা হয়ে কেমন করে' চেপে থাকি বল দিকি? সইবে কেন? ও কাজ তোমরা পারো।'

'সব কথাই কি বলতে হয় পিসিমা? আর মেয়েটারই বা এমন কি দোষ, যজ্ঞিবাড়ীতে গিয়ে না হয় একটি ছেলের সঙ্গে একবার হেসে কথা বলেছে, তাতে আর এমন কি মহাভারত—'

মুখ ঝাম্‌টা দিয়া ছোটপিসিমা বলিলেন, বৌ-মানুষের মুখে এসব কথা মানায় না, আমাব কাছে তুমি যে মত্ পের্‌চার কর্‌লে এ যদি কেউ শোনে ত তোমার আর রক্ষে নেই মা; যাও তুমি নিজের কাজে যাও বাছা।'

ধমক খাইয়া নূতনবৌ সেখান হইতে একটু হাসিয়া সরিয়া গেল। ছোটপিসিমার দংশনকে সে সত্যই ভয় করে।

গোকুলবাবুর নীচের ঘরে সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই তাসের আড্ডা বসে। কবিরাজ মহাশয় আসেন, আমাদের মামা যান্, নিত্যহরি যায়, পাট-গুদামের ব্রহ্মচারী গুটি গুটি আসে, শোনা যায়

তাহার ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কয়েকটা কৌতুকপ্রদ গল্প আছে, এজন্য অনেকেই তাহাকে এড়াইয়া চলে, আর আসে ভাদুড়ী মহাশয়ের ভাগ্নে ভানু, একটা কোন আড্ডা না হইলে সন্ধ্যা তাহার কাটিতে চায় না। ছেলেটির কাজকর্ম্ম কিছু নাই—বেকার।

'বুঝলে মাণিক, কবরেজের কিত্তি জানো ত? সন্ন্যাসিনী মায়ের নাম করে' বাজারে মাতুলিটা কেমন চালিয়ে দিলে? এক টাকা স' পাঁচ আনা দাম···যার ছেলে হয় না, স্বামী যাকে নেয় না, যার চরিত্রের ওপর স্বামীর সন্দেহ···বুঝলে কিনা, একটি মাতুলি বাঁ-হাতে ধারণ করলেই—বাস্, সব ঠিক।'

তাহার কথাটা ছাড়িয়া দিয়া একজন তৎক্ষণাৎ বলিল, 'কিন্তু যাই বল, ফাঁকি দিলে ও-বাড়ীর রামবাবু। বড় ভাই মারা যাবার পর ভাইপোরা নাকি 'হ্যান্ নোট্' কেটেছিল কোন্ মাড়োয়াড়ীর কাছে, অন্তত রামবাবু তাই বলেন। তিনি করলেন কি, এক মাড়োয়াড়ীকে সাজিয়ে এনে ভাইপোদের সম্পত্তি নিলামে চড়ালেন।'

'কে কিন্‌লো?'

'কেন, নিজেই! যৌথ সম্পত্তি, বাইরের লোককে আন্‌বে কেন? মাড়োয়াড়ীকে দিলেন কিছু ঘুষ—তারপর নিজেই সর্ব্বে-সর্ব্বা। আহা, মা-বাপ মরা ছেলে দুটো মনের দুঃখে কোথায় চলে গেছে তার কোনো পাত্তাই নেই। যাবার সময় বলে' গেল,

'খুড়িমা, পরের বারে যেন তোমারই পেটের ছেলে হয়ে ফিরে আসি। যারা তোমার মত নারীর সন্তান হতে পারে না, সেই নিরপরাধরাই পায় সংসারে অনন্ত দুঃখ।' রামবাবুর স্ত্রী তার উত্তরে বললেন, দূর হয়ে যা আঁটকুড়ির বেটারা।'

ওপাশে তাসের খেলা তেমনিই চলিতেছিল। এই করুণ ঘটনার প্রতি যে কাহারও সহানুভূতি আছে এমন বোধ হইল না। তাস খেলা তখন অত্যন্ত জমিয়া উঠিয়াছে।

'বলি কি হে সতীশ, তোমার বড়বাবু হতে আর দেরি কত?'

'আর দাদা, এই [illegible] কাঁটা তুলতে পারলেই বুঝবো তবু কিছু করলাম। লোকটা মেয়ের বিয়েতে ছুটি নেবে, ছুটি কিন্তু ওর আর পাওনা নেই, এই ফাঁকে সায়েবকে একটুখানি ···বুঝলে না, আমি বাবা বারেন্দ্র বামুন।'

আর একজন ওপাশ হইতে অন্য কথা পাড়িয়া এই অনাবশ্যক বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টাটাকে বিসদৃশ করিয়া দিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণটি অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

'ভাড়া আদায় হলো মামা?'

বাড়ীওয়ালা মামা কহিলেন, 'হতেই হবে, কেরাণীবাবু আমার খপ্পর ছেড়ে যাবেন কোথায়! মনে আছে সেই যে সেবার, না তোমরা তখন এ পাড়ায় আসো নি, আমার ওই নীচের ঘরটায় ছিল একঘর···ছেলেপুলে নিয়ে মাগী বিধবা হলো, ঘরভাড়া আর

আদায় করতে পারি নে। বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, মাগী আমার ঘর থেকে একদিন চাল চুরি করল, ধরাও পড়ল একেবারে হাতে হাতে—গিন্নি ধরল বেটিকে জাপটে, আর আমি ধরলাম খ্যাংরা···হাঃ হাঃ হাঃ—'

'তারপর মামা ?'

'এ ত গেল চুকে। কিন্তু আমি বাবা ঘরের ভাড়া ছেড়ে দেবার পাত্তর নই, ও আমার ধম্মের পয়সা, ওই আমার পুঁজি। মাগীকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখালাম। ঘরও ছাড়বে না, ভাড়াও দেবে না ; বলে, যাবো কোথায় বলে' দিন্। আ মর, যা না যমের বাড়ী ? মেয়েমানুষের কোনো উপায় না থাকে, একটা উপায় ত আছে!' বলিয়া মামা একটু হাসিলেন, তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, 'শেষকালে ভাই আর রাগ সহ্য হলো না, 'ইজেক্টমেণ্ট্ স্যুট্' করলাম। বাস্, এবারে যাবে কোথা ঠাকরুণ ? পাশের লোক এসে, বুঝলে ভাই, ধড়াধ্বড় তার ডেও-ঢাক্না ছুড়ে ছুড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল রাস্তার ওপর। সে যা রগড়, হেসে আর বাঁচি নে। বিছানা-মাদুর, থাল-ঘটি, বাক্স-প্যাট্‌রা সব রাস্তায় গড়াগড়ি···একেবারে তচনচ। দেখলাম, চোখ দিয়েছেন বিধি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিধবা মাগীর মজাটা দেখলাম! কে যেন আমার কানে কানে বললে, এবারে খুসী হয়েছ ত ? ছুঁড়ি আমায় সাত্যিই জব্দ করেছিল ভাই ; ভগবানের রাজ্যে বিচার আছে ত!'

'এবার কি করবে?'

'এবারেও হয় ত তাই হবে। তবে পুরুষমানুষ কিনা, একটু বেগ দেবে। যতই হোক ভাই, কেরাণীবাবুর দুর্দ্দশা দুনিয়াসুদ্ধ লোককে না দেখিয়ে আমি ছাড়চি নে। বাপ-দাদা যার ঘর-দোর রেখে মরে না, সে ত পথের কুকুর, পথেই সে যাক্‌, তাদের দেখলেও আমার ঘেন্না করে ভাই।'

সবাই কহিল, 'তা সত্যি বলেছ মামা, দারিদ্র্যটা বড় পাপ।'

*

* *

সীতেশ এবং দামিনীর এখনও সন্তানাদি হয় নাই। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়াই সুমুখে দুইখানি পাশাপাশি তাহাদের ঘর। ঘরে আসবাবপত্র একরকম নাই বলিলেই হয়। দেয়ালগুলি শাদা, একেবারে ধবধবে শাদা, ছবি টাঙাইয়া তাহাদের শুভ্রতাকে এখনও জর্জ্জরিত করা হয় নাই। মেঝের উপর দুইখানি নূতন খাট, জামা কাপড় রাখিবার একটি বাক্স, ছোট একটি টেবিলের উপর খান-কয়েক বইয়ের সঙ্গে একখানি আয়না, বুরুশ, একটি সরু-দাড়া চিরুণী, আল্‌তার শিশি ও সিঁদূরের কৌটা। ঘরের একপাশে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি আসবাব—বাসন-কোসন, চায়ের সরঞ্জাম, মশলা-পাতি, চাল-ডাল—বাস্‌, ওই পর্য্যন্তই। এগুলি

ছাড়া অনাবশ্যক সৌখীন বস্তুর বোঝায় ঘর দুইটির নিশ্বাস রোধ করা হয় নাই।

দামিনীর মাথার ঘোমটা টানিয়া সরাইয়া দিলে দেখা যাইবে মেয়েটি ছোট। সীতেশ স্বামী না হইলে তাহাকে আবার ইস্কুলে পাঠানো চলিত।

ষ্টোভে রান্না চড়াইয়া আসিয়া দামিনী লুডো খেলিতে বসে। লুডো দেখিয়াই সীতেশ স্নানাহার করিবার কথা ভুলিয়া যায়। খেলা চলিতে থাকে।

'কাল আমাকে মিথ্যে করে' হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওকি, ওকি হল'? দু'ঘর যে এগিয়ে নিয়ে গেলে? কী জোচ্চোর!'

'কই? কোথায় জোচ্চুরি? আমায় গালাগাল? মুখ-পুড়ি—' বলিয়া সীতেশ তাহার একটা কান ধরিয়া টানিয়া দেয়।

কানটি একটু একটু করিয়া দেখিতে দেখিতে রাঙা হইয়া উঠে। হঠাৎ দামিনীর গায়ের রক্ত গরম হইয়া যায়। খপ্ করিয়া সীতেশের মাথার একমুঠি চুল সে টানিয়া ধরে—'মারলে যে? আমার লাগে না?'

সীতেশ একটা হাত দিয়া লুডো ছড়াইয়া দেয়। দামিনী অমনি চীৎকার করিয়া উঠে। স্বামী উঠিয়া এই সুযোগে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। এই লুডোর প্রতি দামিনীর মমতা সীতেশের প্রতি ভালবাসার চেয়েও বেশী। স্বামীর সে আজ আর রক্ষা রাখিবে

না। এদিক ওদিক তাকাইয়া বেতের ছড়িটা সে খুঁজিতে থাকে—'দাঁড়াও যাচ্ছি, আমার গায়ে হাত তোলা তোমার বার কচ্ছি গিয়ে।'

ছড়ি লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখে, মোটা একটা লাঠি হাতে লইয়া স্বামী বীরদর্পে দণ্ডায়মান। দামিনী তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম করিয়া বলে, 'আর কান ধরবে অমনি করে? এই বিদ্যে তোমার?'

'বেশ করব।' বলিয়াই সীতেশ আবার দে-দৌড়। দামিনী ছুটিল পিছু পিছু।

তারপর আবার সন্ধি হইল। যে চোখে দামিনী শাসন করে, সেই চোখেই সে আনে মায়া। তাহারই হইল জিৎ।

দামিনী রান্না করে, সীতেশ বসিয়া যায় কুটনো কুটিতে। খাইতে বসিয়া তরকারী ঠিক সমান ভাগ হইল কিনা, এই লইয়া দুইজনে বাধায় কলহ। কিন্তু আহারাদির পর দামিনী যখন ঘর ধুইতে থাকে, সীতেশ বসিয়া যায় বাসন মাজিতে।

বিকাল বেলা তাহাদের বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই-ই চাই। আল্‌তা পরা দুইখানি ছোট ছোট পা রেশমী চটির মধ্যে ঢুকাইয়া সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া দামিনী বলে, 'চল।'

সীতেশ দরজায় লাগায় চাবি-তালা। তারপর ছড়িটা হাতে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুইজনে বাহির হয়। সরু গলিটি

পার হইবার আগেই বাঁ-হাতি পুরাতন বাড়িটির নীচের একখানি অন্ধকার ঘরের একটি জানালা পার হইতে হয়। অন্য দিনের মতো আজও সেই জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দামিনী একটু হাসিয়া বলিল, 'ভাল ত?'

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলা সে একটি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে। গায়ে তাহার জামা নাই, ময়লা একখানি কাপড় পরিয়া ঠিক এই সময়টিতে সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘাড় নাড়িয়া স্মিতমুখে মৃদুস্বরে সে কহিল, 'কতদূর যাওয়া হবে?'

দামিনী বলিল, 'বায়স্কোপে যাব, একটা নতুন ছবি এসেছে।' বলিয়া স্বামী-স্ত্রীতে চলিয়া গেল।

মেয়েটি চুপ করিয়া তাহাদের পথের দিকে দেখিতে লাগিল। রূপ তাহাকে বিধাতা দেন্ নাই, অবস্থার দৈন্য সে মুখখানিকে আরও মলিন করিয়া রাখিয়াছে। দামিনী যেন আলো, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে সবাই উজ্জল হইয়া উঠে, চলিয়া গেলে আবার সব অন্ধকার হইয়া যায়।

রাস্তায় পড়িয়া সীতেশ বলিল, 'পথে বিপদ না ঘটে।'

দামিনী একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল, বলিল, 'কেন?'

'ওই অযাত্রা মুখ দেখে বেরোলাম।'

দামিনী চঞ্চল, ছেলে-মানুষ, কিন্তু হৃদয়হীন নয়। মানুষের

স্বামিত্ব এবং পিতৃত্বটা হইতেছে পাপ! খগেনবাবুর অনেক গুণ! রবিবারের সমস্ত দিনটা বীণা একেবারে তটস্থ হইয়া থাকে। পিতৃদেবের আগমন, বিশ্রাম, আহার এবং তামাকু সেবনের গণ্ডগোলে আশপাশের গৃহস্থরা সজাগ হইয়া উঠে।

রাত হইয়াছে। হাত-পাগুলা এখনও গরম হয় নাই বটে। বীণার স্তিমিত তন্দ্রার ঘোর কি যেন সাড়াশব্দ পাইয়া হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। ও-বাড়ীর সেই ছেলেটি এতক্ষণে ফিরিয়াছে। সম্প্রতি কলেজ ছাড়িয়া ছোক্‌রা দেশের কাজে নামিয়াছে। নাম —সুরেন। তাহার গলার আওয়াজ যেন দূরের বৃহৎ পৃথিবীর বার্ত্তা বহিয়া আনে।

'বুঝলে মা, তুমি বিশ্বাস করবে না বললে, সমস্ত দেশটায় আজ মেয়েরা এনেছে উৎসাহের জোয়ার। ধরা পড়েছে কত শুন্‌বে? অসংখ্য! মেয়েদের আর সেদিন নেই। সমস্ত দেশ আজ বিস্ময়ে ও আনন্দে মেয়েদের নতুন পা ফেলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'

'সে কি রে? মেয়েদের এমন করে' দড়ি খুলে দেওয়া? এর পরিণাম কি ভাল?'

'ওই তোমাদের দোষ। তোমরা নিজেদের শক্তিকে চেনো না। দু'টো পা নৈলে সমাজ চল্‌বে কেমন করে'? মেয়েরা এতদিনে বুঝেছে যে আমরা তাদের বেঁধে রাখিনি, নিজেদের জালেই এতদিন জড়িয়েছিল।'

এ যেন নূতন দেশের কথা, এ যেন কোন্ দূর সাগর-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস—অন্ধকার কারাগারের ফাটলে এ যেন একটি সুতীব্র সূর্য্যরশ্মি।

কাঠের পার্টিশানের ফাঁক দিয়া বীণা এতক্ষণ সেই যুবকটির দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার মনে হইল, এগুলি ত মুখের কথা মাত্র। যে-মেয়েরা আজ পথের গাড়ী-ঘোড়া, আপদ-বিপদ বাঁচাইয়া চলিতে শিখিয়াছে, সে মেয়ের সংখ্যা কতগুলি? কিন্তু যাহাদের মূঢ় মূক জীবনে সামান্য বর্ণ-পরিচয়ও হইল না, পৃথিবীর পটে যাহারা কোন দাগই টানিল না, জীবনের মূল্য যাহারা কোনদিক দিয়াই বুঝিতে শিখিল না, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার তলায় যাহাদের সমস্ত সম্ভাবনাই তলাইয়া গেল, যাহাদের মনের আলো ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশের কোনো পথই পাইল না, আপনি কি সেই সব মেয়েদের খোঁজ-খবর কিছু রাখেন? উঁচু গলায় যদি বীণা এগুলি বলিতে পারিত!

'তুমি দেখবে মা, এই যে মেয়েরা জাগ্‌চে, এরাই হবে ওদের সকলের চেয়ে বড় শত্রু। মেয়েদের স্বাধীনতা যে সমাজের পক্ষে কতখানি স্বাস্থ্যের লক্ষণ তা ওরা খুব ভাল করেই জানে। এবারের এই আন্দোলন, এই পীড়ন, এই অরাজকতা সার্থক হয়েছে নারী-জাগরণের মধ্যে। যে নবীন ভগীরথ এই জাগরণের স্রোত টেনে এনেছেন তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।'

আনন্দের উচ্ছ্বাসে সুরেনের মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো বীণা একটু হাসিল! হায় রে জাগরণ! একটিমাত্র প্রদীপের কাছে বসিলে কি পৃথিবীর সকল অন্ধকারকে ভুলিয়া যাইতে হয়? সংখ্যায় যে-মেয়েরা অধিক, তাহাদের যে আজও বিবাহের পাত্র জুটে নাই, তাহারা যে পায় পিতার অনাদর, মাতার অভিশাপ, তাহারা যে পায় স্বামীর অবহেলা, পরিজনের লাঞ্ছনা। যে-বৃহৎ নারী-সমাজের কাছে আজো দিনের আলো আসিয়া পৌঁছায় নাই, সেই অনড় অচল কোটি কোটি অবলা মাথায় লইয়া আছে যত কিছু পাপ, যত শাস্ত্রের শাসন, যত কলঙ্ক, যত আত্ম-অপমান, জীবন ধারণের যত কিছু সঙ্কীর্ণতা—কিন্তু থাক্, বীণা কতটুকুই বা বোঝে!

যুবকটির শক্তি এবং সাহস-বিস্তৃত দেহ আপাদমস্তক খদ্দরে ভূষিত। সাংসারিক অবস্থা তাহার ভালই, দেশে বেশ আয় আছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বীণাদেরই স্বশ্রেণী, প্রৌঢ়া মা তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন।

রাত্রে বীণার চোখে ঘুম আর আসিতেই চায় না। প্রথমত, শীতকালের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার মতো গরম কাপড় কিছু নাই; দ্বিতীয়ত, আহারে রুচি থাকাটা তাহার অভ্যাস-বিরুদ্ধ। সহানুভূতি দিয়া, মমতা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া কতবার সে এই

সংসারের অবস্থাটাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু না, এখন তাহার ইচ্ছা করে, দুই ধারালো নখে সংসারের এই জটিল শ্বাসরোধকারী আবরণটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, বাঁচিয়া থাকিবার নাম করিয়া এমন শোচনীয় জঘন্য মৃত্যুকে সে আর আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাহার ইচ্ছা করে বৃহৎ জগতের রাজপথে নামিয়া গিয়া লোক জড়ো করিয়া বলে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ইহা সত্য নয়, আমাদের যাতনা, আমাদের দুঃখ কোথায় তাহা তোমাদের জানা নাই; আমাদের অকল্যাণ, আমাদের অভিশাপ তোমাদের চোখে পড়ে না, তোমাদের এই সৌখীন দেশপ্রীতি উচ্ছন্নে যাক্।—হায় রে, যদি সে আপন কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়াও এই স্পষ্ট কথাটা বলিয়া আসিতে পারিত।

বীণার বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি, জ্ঞান হওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত পিতাকে সে ভাল চোখে দেখিতে পারিল না। লোকটা ভীরু, কটুভাষী, কুরুচিসম্পন্ন, অশিক্ষিত, জ্ঞান ও সদ্বিবেচনার দিক হইতে ভদ্রসমাজের অযোগ্য। পিতার প্রতি তাহার এতটুকু শ্রদ্ধা নাই। মা হইতেছে চিররুগ্ন, কদাকার, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী—মাকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। পিতামাতার পরিচয় হইতেছে তাহার জীবনের সকলের চেয়ে কঠিন ব্যাধি।

কলরব

আবার সকাল হইল। গতরাত্রের উত্তেজনার কথা ভাবিয়া লজ্জায় বীণা শিহরিয়া উঠিল। গায়ে, হাতে, পায়ে তার ব্যথা, শরীর অবসন্ন, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। মন যেমন নিরুৎসাহ, তেমনি উদ্দেশ্যহীন। উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে।

পিতা কহিলেন, 'এত বেলা অবধি ঘুম? রাত জেগে বই পড়া চল্‌বে না আমার কাছে, দিন দিন ত বাদুড়ের মতন চেহারা হচ্ছে, আর কিছুদিন বাদে পাত্তরও জুটবে না, মুখে আগুন মেয়ের।'

মাতা কহিলেন, 'মাথার চুল ত আদ্ধেক উঠে গেছে, কাল যারা দেখতে আসবে, ও-রূপ তাদের কাছে বার করবি কেমন করে' আবাগি?'

সকাল বেলা বাসনগুলি একত্র করিয়া বীণা মাজিতে বসিল। কোনো প্রতিবাদই তাহার মুখে আসিল না।

*

* *

জানালার কাছে চুপ করিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া ছিল। আশ-পাশের বাড়ীগুলি হইতে মেয়েদের বিচিত্র আলাপ তীরের মতো তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছিল। খানিকটা অর্থ তাহাদের আছে, খানিকটা নাই।

'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এ বাছা শাস্তরেই আছে।'

'তা বলে' মাথা ফাটাফাটি হবে মা, তুমি বল কি? বৌ-মানুষ গিয়ে ভাসুরের মুখের ওপর বাপান্ত করে' এল! কান-ভাঙানিতে কি না হয়, যে মা পেটে ধরে' এত বড়টা করলে তারই গলা টিপে সেদিন—'

আর একঘর হইতে শোনা গেল, 'নিজের বেলা আঁটিসুঁটি! ও সিঁদুর তোর কপালে কিছুতে থাকবে না, যদি আমি বামুনের মেয়ে হই, সোয়ামির হাঁড়িতে যদি একদিনের তরেও চাল দিয়ে থাকি—'

'যা-যাউলির ঘর, এ আর নতুন কি দেখবে মা, নিজের ছেলের পাতে দু'খানা মাছ পড়ে, ছোট বো'র ছেলে খায় ন্যাজার মাছটুকু,—আলোটা আড়াল করে' বাছাকে খাওয়াতে বসে।'

আর একজন কহিল, 'এই কিত্তি, বুঝলে পিসি, দজ্জাল বৌটার এই কিত্তি কি আর চাপা থাকবে তুমি মনে কর?'

'আরে রামো, ঐ সীতেশ ছোঁড়ার বৌটার কথা ত? আর বলিস নে বাছা। ছি মা ছি, পাড়া-বেড়ানির লজ্জা-সরম কি এতটুকু আছে গা? স্বামী ছোঁড়া ত ভেড়ুয়া, বাজারও করাচ্ছে, বাসনও মাজাচ্ছে, এবার পরণের কাপড়খানাও না কাচিয়ে নিলে বাঁচি। এখনকার মেয়েরা তাও পারে।'

একটা উচ্ছৃঙ্খল হাসির ঝড় সেই অদৃশ্য মজলিসটার উপর দিয়া বাহিয়া গেল।

কিন্তু বামুন-বাড়ীর গোলমালটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ ও অশান্তভাবে উচ্চে উঠিয়া আর সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিধবা বালিকাটিকে লইয়া সকলেই তাহারা তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

'মর্ মর্, নিপাত যাক্ অমন মেয়ে, হে ভগবান।'

মরণের কথা শুনিলেই নির্ব্বোধ মেয়েটা আর হাসি চাপিতে পারে না। বলিল, 'দেখবে কাকিমা, দেখবে? আগুনে আঙুল পোড়াবো, একটুও লাগবে না, দেখ্‌বে?'

মা কহিল, 'পোড়া না, তা হলে ত বাঁচি। শুধু আঙুল কেন, মাথা থেকে পা অবধি···এত লোকের মেয়ে পুড়ে মরে, আর তুই—'

'ইস্, পুড়লেই অমনি হল'। পুড়তে কিনা পয়সা লাগে না!'

স্ত্রী-পুরুষগুলিকে লইয়া খেলা করিতে কি জানি কেন মেয়েটির ভাল লাগে। পিসী চীৎকার করে, 'আয়, তোর মেঘের মতন চুল কেটে চুলোয় দিই আয়। পোড়া খুন্তির দাগ তুলে দিই মুখে, ও সর্ব্বনেশে রূপ তোর ঘুচে যাক্।'

মেয়েটা বলে, 'ধরতে পারলে ত! ছুটতে পারবে আমার সঙ্গে?'

বাপ দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া বলেন, 'যম বুঝি ধর্ম্মঘট করেছে?'

মা বলে, 'হারামজাদি, তুই ত আমার একটা নয় যে এত আব্‌দার! কেন, ধোনা-বুন্টুকে অমন খুসে খুসে মারিস্ কেন? শাঁখা সিঁদুর নেই তবু তোর এত বিষ? বলি,

ফেনির পুতুলটা কেড়ে নিয়ে অমন করে মচ্‌কে ভেঙ্গে দিলি কেন? পোড়ারমুখি, ভাই-বোনের অনিষ্ট করে' তোমার এত আনন্দ?'

কাকিমা বলে, 'ছুঁড়ি পণ করেছে আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

মা বলে, 'মুখে আগুন, মাটির ভেতর যা না, আমাদের শান্তি হোক।'

জানালার কাছে ক্লান্ত হইয়া শঙ্কর বসিয়া পড়ে। অশিক্ষায় যাহারা অন্ধ, অজ্ঞানের অন্ধকারে যাহারা চিরদিনই আচ্ছন্ন এমন কতকগুলি গৃহস্থের জটিল [illegible] মাঝখানে তাহার সমস্ত বাল্যকালটা কাটিয়াছে। সে প্রতিদিন ধরিয়া শুনিয়াছে মানুষের নীচ প্রবৃত্তির কথা, জীবনের অপমানের অলজ্জ ইতিহাস, কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির কুৎসিত পরাজয়! চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, প্রতিদিনের এই জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে তাহাকে এমনি করিয়াই ভাগ লইতে হইবে! দিনের পর দিন ধরিয়া সে শুনিতে থাকিবে নিপীড়িতা ওই বালবিধবাটির প্রতি অত্যাচার, পুত্রহারার আর্ত্তনাদ, রোহিণীবাবুর একঘেয়ে হাঁপানির কাসি, গোকুল বোসের স্ত্রীর গহনার ক্ষোভ, এবং দুশ্চরিত্র মাতালের মুখে সতীত্বের গবেষণা! অর্থহীন বেদনায় শঙ্করের চোখ দুইটি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

কলরব

সেদিন সে ঘর হইতে চুপি চুপি চোরের মতো বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, তাহার আপন হাতে বসানো গাঁদাফুলের চারাটি শুকাইয়া গিয়াছে। আজ একবার তাহার মনে হইল, ছুটিয়া একবার সে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসে। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাহিরের নূতন আকাশ হইতে আনে নূতন নিশ্বাস, বনে-পর্ব্বতে-নদীতে-সাগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনে অপরিমেয় স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত পরমায়ু—চোখে তাহার নবজীবনের স্বপ্ন, বুকে তাহার অনন্ত আশা! দশদিক আজ তাহার বিষ-নিশ্বাসে ও মৃত মানবের দুর্গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। পা দুইটা তাহার দুরন্ত আবেগে কাঁপিতেছিল।

বামুন-বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়াই তাহাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। ফুলের ভারে যে গাছ অবনত হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে দেখিয়া একবার না দাঁড়াইয়া কেহ চলিয়া যাইতে পারে না। শঙ্কর মুখ তুলিল। তাই ত, এ যে সেই চিরদিনের উৎপীড়িতা মেয়ে! তেপান্তরের মাঠ অতিক্রম করিয়া এ যে সেই সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের রাজকন্যা! এ যে সেই!

পাড়ার মেয়ে। বিধবা হইবার আগে এই সেদিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত শঙ্করের আলাপ ছিল। আলাপ অতি সামান্যই। মেয়েটার পরণে শাদা থান। নিবিড় অন্ধকারের বিন্দুর মতো কালো

কালো দুইটি তাহার আয়ত চক্ষু। মাথা হইতে চুলগুলি যেন নব বর্ষার মতো চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শরতের নদীর ন্যায় পরিপূর্ণ তাহার দেহ। গৌরবর্ণ তনুলতাকে জড়াইয়া ধরিয়া শাদা থান্‌খানি চিরকালের জন্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

চোখে চোখে তাহাদের যুগান্তকালের স্বপ্ন কথা কহিয়া উঠিল। —সাগর এবং আকাশ যেমন করিয়া পরস্পরের সহিত কথা বলে। দুইজনে যেন বহু জনমের ঘাটে ঘাটে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আজ পরস্পরের দেখা পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আজিকার নিস্তব্ধ দিবালোক কিশোর-কিশোরীর নিবিড় পরিচয় লইয়া সুরে সুরে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। এ যেন বিস্ময়, আর ও যেন রহস্য!

শঙ্কর কহিল, 'তুমি?'

মেয়েটি প্রথমে ঘাড় নাড়িল, তারপর গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'হ্যাঁ···তোমার গাঁদার চারাটা আছে এখনো?'

শঙ্কর কহিল, 'না, সে মরে গেছে।'

'মরে গেছে? ও।'

ঢোক গিলিয়া শঙ্কর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'আচ্ছা, তোমাকে এত কষ্ট দেয় ওরা, তুমি চলে' যেতে পারো না?'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া মেয়েটি কহিল, 'চলো যাবো? কোথায়? দূর!' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া এক জায়গায় সে বসিতে পারিল না, পা তাহার টলিতেছিল, কেহ দেখিতে পাইয়াছে কি না ভাবিয়া ভয়ে তাহার গা কাঁপিতেছিল—সারা বাড়ীটায় সে আপন মনের অসহ্য অস্থিরতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখে তাহার জল আসিতেছিল, প্রাণপণে আপনাকে শক্ত করিয়া সে চোখের জল চাপিবার চেষ্টা করিল। আপনাকে সে হয় ত এতদিন জানিতে পারে নাই, আজ প্রথম সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লজ্জাকে অনুভব করিয়াছে। নিজের কাছে নিষ্ঠুরভাবে সে ধরা পড়িয়া গেছে।

শঙ্কর বড় রাস্তাটা পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। নিতান্ত সে একাকী, নিতান্তই দিশাহীন। অগণ্য মানুষের মাঝখানে থাকিয়া সকলের নিকট হইতে এত দূরে সে বাস করে! মানুষের মরুভূমির মাঝখানে দিন কাটাইয়া আপন অন্তর তাহার পায়ের কাছে অহর্নিশি মাথা কুটিতেছে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, মেয়েটির কালো চোখ দুইটির মধ্যে কোথায় সে যেন তলাইয়া ডুবিয়া গেছে।

কিন্তু সেদিন হইতে কি হইল কে জানে! এমন পরিবর্ত্তনের কথা কেহ কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিধবা মেয়েটির যেন নবজন্ম সুরু হইয়া গিয়াছে।

ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে

তাকাইতে লাগিল। দিদিকে তাহারা স্বার্থপর, হিংস্র ও দুরন্ত বলিয়া জানিত, কিন্তু এখন দেখিল, দিদির সে চেহারা কে যেন মন্ত্রবলে মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। অথচ এমন মর্ম্মান্তিক ঔদাসীন্যের চেয়ে সে চেহারা যে ছিল ভাল! এত বড় সংসারের মধ্যে যে ছিল মূর্ত্তিমতী অশান্তি, আজ কোথাও তাহার সাড়াশব্দ নাই। এখন তাহাদের দিদির চোখে জাগিয়া আছে শুধু বাতায়ন-পথের আকাশ, উত্তপ্ত দিনের ঢুলঢুলে হাওয়া, অবারিত পথের মায়া এবং নিদ্রাহীন নিশীথ রাত্রির অকারণ এবং অবারণ অশ্রুজল।

ধোনা, বুণ্টু ও ফেনি আসিয়া আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া যায়। যে খেলার পুতুলগুলিকে লইয়া কলহ-বিদ্বেষের সীমা ছিল না, সেইগুলি হাতে লইয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া সজল চক্ষে তাহারা বলে, 'দিদি, নিবি ভাই, এসব আমাদের আর চাই না, নিবি?'

দিদি মুখ ফিরাইয়া উদাসীন হইয়া বলে, 'যা তোরা এখান থেকে, কিছু আমার চাই নে।'

জীবনের একটি তুচ্ছ ঘটনায় চোখের পলকে কাহার জীবন কেমন করিয়া কখন্ ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা ছোট ভাই-বোনগুলির বুঝিবার শক্তি ছিল না!

* *

*

কলরব

দোতলার গোলমাল স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। দুর্বোধ্য এবং অসংযত সেই কোলাহলকে এড়াইবার জন্য ডাক্তারবাবু একখানি বই খুলিয়া লইয়া বসিয়াছিলেন। এই বাড়ী ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার আর নিস্তার নাই। প্রতি রবিবারে এই শাস্তি তাঁহাকে সহিতেই হয়।

'—তা বৈ কি, হ্যাঁ—মাছ খাওয়া উঠে যাক্ তা বল্‌ব না, তুমি আমার ছেলের বউ। কিন্তু চুরি করে' খেলে ওলাউঠো হয় মা।'

'বলি হ্যাঁ গা, নতুন বো'য়ের এই কীর্ত্তি?'

'এখনকার মেয়ে যে মা, এদের কীর্ত্তি অনেক, সব যে আমরা জান্‌তে পারি নে।—থাক্ বাছা থাক্, পা ছুঁয়ে আর দিব্যি গাল্‌তে হবে না।'

ওপাশ হইতে অপর কণ্ঠের চীৎকার উঠিল, 'যা বলেছ বাছা, এত দেমাক ভাল নয়। বলে, 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে' যাবে।' তোমার না হয় ফারফোরের তাগা আছে, আমার না-হয় দু'কড়া সোনাও গায়ে নেই, তা বলে' অমনি গা ঘেঁষটে চলে' যাবে গা? যতই কর আমি কি আর গাল দেবো? বরং বলি তোমার হাতের নো' বজ্জর হয়ে থাক্। না কি বল গা হিমির মা, আমি কি আর গাল্ দেবো?'

হিমির মা বোধ করি তখন হিমিকে লইয়া নাস্তানাবুদ

হইতেছেন। পাগ্‌লী হিমি তখন চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে, 'সুধামাখা সুরে বল দেখি সখা—'

'ওমা, কোথা যাবো গো, ছি ছি—ওমা চুপ কর মা ?'

'ছেড়ে দাও বল্‌চি···খুন কর্‌ব—'লোহার বাঁধনে বেঁধেছ আমারে—' বলি আসমান্‌তারা, তোমার বাড়ী কোন্‌দিকে ভাই ? হি হি হি ···'না ভাই যাবো না আমি তরুলতা ছাড়ি, সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর বাড়ী। উড়িতে বাসনা মোর'—ইল্লি ?'

ডাক্তারবাবু বইয়ের ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পত্রখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি জানালার বাহিরে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। বোধ করি তিনি কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আকাশের দিকে তাকাইয়াই মানুষ সমস্ত মন দিয়া মানুষের পথ চাহিয়া থাকে।

'কোন্ আবাগি খাওয়ায় চোখ দিয়েছে, আমার মেয়ের কোনো রোগ ছিল না! বাছা আমার নট্ নট্ করে' এল্‌তলা-বেল্‌তলা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।'

'সময় মতন টিকে দাও নি বাছা, দো-আঁস্‌লা সময়—ঝেড়ে মা শেতলার অনুগ্রহ বেরিয়েছে—'

একটি করুণ কণ্ঠের আওয়াজ ইহাদেরই ভিতর হইতে সমস্ত কণ্ঠকে ছাপাইয়া কানে আসিয়া বিঁধিতেছিল।

'তিন কাল এখনো পড়ে' রয়েছে, পেট আমার চল্‌বে কি করে' ? হাজারখানি টাকা, একটি একটি করে' সব তোমাদের সংসারে গেল ! বিধবা মানুষ, না-জানি লেখাপড়া, না কিছু, লোকের বাড়ীতে এর পর কি আমি রাঁধতে যাবো ?'—কথা বলিতে বলিতে মেয়েটির গলা ধরিয়া আসিল।

'ডাক্তারবাবু ?'

ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন। হাঁপানিগ্রস্ত সেই বৃদ্ধ লোকটি দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া আস্তে আস্তে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। হাতে তাহার সদা-সর্ব্বদা থুতু ফেলিবার জন্য একটি টিনের কৌটা থাকে। বার দুই কাসিয়া কৌটার মধ্যে গয়ার ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিল, 'আপনিই বলুন ত ডাক্তারবাবু, টাকায় এক আনা সুদে 'হ্যান্‌নোট' দিলে, এখন আদ্ধেক বৈ সুদ দিতে চায় না ! গরীব ত সবাই বাবা, আমি একটা নালিশ ঠুকে দিই, আপনি কি বলেন ?' ও শালাকে জব্দ আমি করবই।'

ডাক্তার কহিলেন, 'করুন।'

হঠাৎ এ উত্তরের জন্য বৃদ্ধ প্রস্তুত ছিল না। আর একবার কাসিয়া থুতু ফেলিয়া বলিল, 'প্যাঁচ না কস্‌লে টাকা বেরোয় না, বুঝলে বাবাজি ?'

'হুঁ।'

বৃদ্ধের এইবার কি যেন সন্দেহ হইল। ডাক্তারের মুখের দিকে

ভাল করিয়া একবার তাকাইয়া সে পুনরায় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বলিল, 'তাই বল্‌তে এ... ...ম, আর কিছু না, লেখাপড়া জানা লোকের কাছে বুদ্ধি নেওয়াটা ভালই। নৈলে বুড়ো মানুষ, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে আসবই বা কেন বাবাজি?'

রাগ করিয়া টিনের কৌটাটি হাতে ল... ঠুক্ ঠুক্ করিয়া বৃদ্ধটি বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন নীচে ডাক্তারবাবুর ডাক পড়িল। যিনি ডাকিলেন তাঁহার স্ত্রী প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। দাইকে ডাকা হইয়াছিল কিন্তু পারিশ্রমিকের পরিমাণ শুনি... সে আসিতে রাজী হয় নাই। চীৎকার করিলে পাছে চারিদিকে জানাজানি হয় এজন্য বউটি দাঁতের উপর দাঁত দিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

ডাক্তার একটি ঔষধ দিয়া বলিলেন, 'এইটে খ...য়ে দিন গে, এখুনি হয়ে পড়বে। একটু গরম দুধ খেতে দেবেন।'

ভদ্রলোকটি কৃতার্থ হইলেন। বলিলেন, 'যে আজ্ঞে। বড় বিপদ ডাক্তারবাবু। এদিকে এই, ওদিকে আপিসের চাক্‌রি নিয়ে টানাটানি।' তারপর গলা খাটো করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ও আমারই মেয়ে ডাক্তারবাবু, দেখুন ত মশাই, ওকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা!···পাশের বাড়ীর একটা সুন্দোর মতন ছোঁড়া, বড় বড় মেয়েলি চুল, আবার নাকি

পত্র লেখা হয় শুনতে পাই,—ছোঁড়া আমার মেয়ের দিকে···সে আর আপনাকে বল্‌ব কি, বুঝতেই পাচ্ছেন। তবে এক হাতে তালি বাজে না, বুঝলেন ডাক্তারবাবু? সেদিন সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছিলাম···স্বচক্ষে আমি দেখেছি···'

'যান্ ওষুধটা খাইয়ে দিনগে।'

'এই যে—' বলিয়াই লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর সদর দরজা পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই চীৎকার ও কোলাহলের মাঝখানে ডাক্তারবাবু দিশাহারা হইয়া গেলেন। একটি নারী উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছিল। সে-কান্না জরার নয়, দারিদ্র্যের নয়, পঙ্গুতার নয়, সে-কান্না অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর! যে ছোট্ট মেয়েটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সে আর নাই! আর্ত্তনাদে ও দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বাড়ীখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

সকলের অলক্ষ্যে ডাক্তারবাবু তেতলায় উঠিয়া আসিলেন। ঘরে আর আলো জ্বালা হইল না, জানালার ধারে অন্ধকারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অদূরে মাঠের উপর কয়েকটা নারিকেল গাছের পাতায় সির্‌ সির্‌ করিয়া শব্দ হইতেছিল। প্রথম বসন্তের হাওয়ায় এখনও

একটু একটু ঠাণ্ডার আমেজ রহিয়াছে। আকাশ অন্ধকার, একটিও তারার চিহ্ন নাই,—বোধ হয় মেঘ করিয়াছিল।

কতক্ষণ যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা ডাক্তারের হুঁস ছিল না। হঠাৎ তাঁহার চোখ পড়িল দরজার দিকে। একটি অন্ধকার ছায়ামূর্তি ততক্ষণে নিঃশব্দে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন, দরজা হইতে খাটের আড়ালে তাঁহাকে দেখা যাইতেছিল না। ছায়ামূর্তিটি নড়িয়া চড়িয়া তাঁহার টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল। অতি সাবধান সত্ত্বেও নাক দিয়া মুখ দিয়া তাহার অস্ফুট কান্নার শব্দ বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সদ্যমৃতা বালিকার মাতা সেদিনের সেই শীর্ণকায় বধূটিকে ডাক্তার এতক্ষণে চিনিতে পারিলেন। বকের মতো তাহার দুইখানা সরু সরু পা।

যে ড্রয়ার হইতে সেদিন ডাক্তার টাকা লইয়া তাহাকে ধার দিয়াছিলেন, বউটি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেটি খুলিল, খুলিয়া ভিতরে হাত বুলাইয়া কয়েকটি টাকা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিল। ভয়ে ও লজ্জায় বোধ করি তাহার হাত পায়ের ঠিক ছিল না, একটু আধটু সাড়াশব্দ হইতেছিল।

তার পর আর না বলিলেও চলে; টাকা হাতে পাইবামাত্র চোরের মতো সে যখন লুকাইয়া আবার দ্রুতপদে বাহির হইয়া

চলিয়া গেল, ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উঠিয়া আসিয়া আলো জ্বালিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নীচে যখন মৃতদেহ বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় পিছু পিছু আর একবার নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর মনে হইল, বউটি যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সত্যই কি মৃতদেহ সংকার করিবার মতো অর্থ তাহাদের ছিল না? কে জানে!

চুপ করিয়া বসিয়া চারিদিক যখন ধীরে ধীরে শোকাচ্ছন্ন নীরবতায় নিস্তব্ধ হইয়া গেল, ডাক্তারবাবু তখন সকালের অসমাপ্ত পত্রখানি শেষ করিতে বসিলেন। লিখিলেন—

'...অথচ জানো প্রমীলা, প্রতিদিনের বিচিত্র জীবন-ধারা তবুও এতটুকু বাধা পায় না, দারিদ্র্য ও দুঃখের দুই তটে ঘা খেয়ে খেয়ে অনর্গল সে বয়ে যেতে থাকে। সেই অবারিত স্রোতে যত গ্লানি, অপমান, পঙ্গুতা, অন্যায়, শাঠ্য, এদের অশিক্ষিত মনের যত কিছু আবর্জ্জনা ভেসে ভেসে চলে। জরা ও মৃত্যুর আঘাত মাঝে মাঝে শুধু সেই স্রোতে একটু আধটু আবর্ত্ত ও রহস্যের সৃষ্টি করে; তখন সবাই চম্‌কে ওঠে। এদের চোখে জীবনের কোনো উজ্জ্বল আশা কিম্বা কোনো আনন্দময় ভবিষ্যৎ নেই, এদেরই নাম মধ্যবিত্ত। এদের জীবনের নিরুপায় অন্ধতা কবে ঘুচ্‌বে প্রমীলা, বলতে পারো?'

ডাক্তারবাবু দেওয়ালের দিকে চাহিয়া চিঠির শেষ অংশটুকু

ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

*

* *

দিন দুই পরে সেদিন সন্ধ্যার পর সুরেন কি একটা স্বদেশী সভায় গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। মাথার ভিতর হইতে তখনও তাহার ঝাঁজ কাটে নাই, বক্তার শেষ কয়টা কথা মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে তাহার সমস্ত পথটা কাটিয়া গিয়াছিল।

গলির ভিতর প্রবেশ করিবার আগে বাঁ-হাতি জীবন চৌধুরীর নীচের ঘরটার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। জানালার সুমুখে পর্দাটার উপর ঘরের ভিতর হইতে আলো পড়িয়াছে। আলো দেখিয়া সে খুসী হইল। সুমুখের মুদীর দোকানে জনকয়েক লোক বসিয়া বসিয়া জটলা করিতেছিল, সুরেনকে দেখিয়া তাহারা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া গেল। এই ছেলেটিকে তাহারা ভয়ানক ভয় করে, ইহার উপর ধারণাও তাহাদের তেমন ভাল নয়, তাহাদের বিশ্বাস, পাড়াসুদ্ধ লোক হয়ত ইহার জন্য একদিন বিপন্ন হইবে।

সুরেন আবার ফিরিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া সে

দোকানের লোকগুলোর দৃষ্টি এড়াইয়া অন্য একটা সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং সেখান হইতে জীবনবাবুর বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

ঘরের দরজায় আসিয়া দেখিল, ষ্টোভের উপর রান্না চড়িয়াছে এবং এইদিকে পিছন ফিরিয়া যিনি আলু কুটিতেছিলেন তিনি এখনও তাহার পায়ের শব্দ পান্ নাই। সুরেন চুপি চুপি ডাকিল 'অমলা-দি ?'

অমলা চকিত হইয়া পিছন ফিরিল। ফিরিয়া গলা খাটো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'এসো, এই তোমারই কথা ভাবছিলাম। কাল যে এলে না ?'—বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া আসিল।

সুরেন কহিল, 'কাল এক জায়গায় চাঁদা তুলতে গিছলাম ভাই। এত দেরীতে যে আজ তোমার রান্না চড়লো ?'

'একটু আগে ফিরলাম, আজ একটা কোচিং ক্লাশ ছিল।' —কিয়ৎক্ষণ থামিয়া অমলা আবার বলিল, 'তুমি না এলে যে ডাকতে যাবার উপায় নেই, তা জানো ত ?'

হাসিমুখে সুরেন বলিল, 'জানি বৈ কি, জানতে পারলে তোমায় জাতে ঠেলবে।'

অমলা বলিল, 'মেয়েমানুষের পুরুষ-বন্ধু থাকা এ দেশের লোক ক্ষমা করে না। দিদি বলে' কি আর রেহাই পাবে ?'

সুরেন বলিল, 'আমি রেহাই পাবো তার কারণ আমি ব্যাটা ছেলে, সাত খুন মাপ, রেহাই পাবে না তুমি। কলঙ্কের বোঝা তোমার মাথায় চাপিয়ে—'

অমলা হাসিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল, 'চাপাতে কি আর বাকি আছে তুমি মনে কর? সে একটা কাহিনী। ভয় নেই, সে কাহিনী এখন বলব না। দাঁড়িয়ে রইলে যে? বসো?'

সুরেন আসিয়া বিছানাটার উপর বসিল। দুইজনের মতো রান্না অমলা চাপাইয়া দিল। সুরেন যেদিন আসে সেদিন এখানে না খাইয়া তাহার চলিয়া যাইবার উপায় নাই। রান্না চাপাইয়া অমলা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর আলোটা আর একটু বাড়াইয়া দিয়া বিছানার উপর উঠিয়া সে পা গুটাইয়া বসিল।

সুরেন বলিল, 'এমনি করে একা একা তুমি থাকতে পারো অমলা-দি?'

অমলা কহিল, 'একা একাই ত থাকতে পারি! তুমি ত জানো কারো সঙ্গে আমার বনে না!'

'কিন্তু ধর এমনি করে' এতদিন—'

'চিরদিনই! যার কেউ নেই তার একজন আছে। আমার সেই একজনই ভরসা ভাই।'

সুরেন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর পুনরায়

বলিল, 'ধর ছুটিছাটার দিন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও ত মিশতে পারো ?'

'না, ওদের সঙ্গে মিশতে আমার ঘেন্না হয় !'

'ঘেন্না হয় ? যাঃ—'

'হ্যাঁ ঘেন্না হয়। ও আমি পারিনে।'

'তারা অশিক্ষিত বলে' তুমি তাদের ত্যাগ করবে ?'

অমলা কহিল, 'অশিক্ষিত বলে' নয়, অমানুষ বলে'।'

স্থরেন কহিল, 'কিন্তু ত্যাগ করে' থাকাটা—'

'ত্যাগ ত করিনে, এড়িয়ে থাকি। কি করব বল, আমি অত্যন্ত স্বার্থপর, ওদের সঙ্গে মিশে আমি মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে রাজি নই।'

'কিন্তু ওরাও ত মানুষ হতে পারত !'

'হতে পারত, কিন্তু হয়নি। হয়নি বলে' কেঁদেও লাভ নেই আর মানুষ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেও ফল নেই ! থাক্ গে, সেদিন যে গল্পটা আরম্ভ করে' চলে গেলে সেটা আজ বল ভাই।'

'কি গল্প ?'

'সেই যে তোমার বন্ধু ছিল, গিরিবালা ? তোমার সেই ছোট বেলাকার—?'

'কতদূর পর্য্যন্ত বলেছিলাম বল ত ?'

অমলা বলিল, 'সেই যে বললে, তেরো বছরের মেয়ের প্রতাপে

সবাই ছিল তটস্থ। বেপরোয়া মেয়ে, মুখের কাছে তার কেউ দাঁড়াতে পারে না, ইংরেজী ভাষায় অনর্গল ধম্‌কাতে পারত, তারপর যেত ট্যাক্সিতে চড়ে’ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে ?’

সুরেন কহিল, ‘হ্যাঁ, গিরিবালা দু’হাতে দিত নিজেকে ছড়িয়ে। তার বিশ্রাম ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, তাকে বাঁধতে গেলে প্রথম গ্রন্থিতেই ফাঁস যেত খুলে। গিরিবালার যত ছিল আনন্দ, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে ছিল তার উত্তেজনা, প্রাণময়তা।’

‘তারপর ?’

‘একদিকে সে যেমন একটির পর একটি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে লাগ্‌ল স্কলারশিপ্‌ নিয়ে, অন্যদিকে মেয়েদের নিয়ে সে গড়্‌ল দল। জীবনে যারা আলো দেখেনি, তারা দেখ্‌ল বিদ্যুৎ। নিশ্বাস ভরে’ যারা বাতাস নিতে পারেনি কোনোদিন, তাদের ওপর এল ঝড়। গিরিবালাকে নৈলে মেয়েদের আর চলে না। তারপর দেখতে দেখতে তেরো গিয়ে দাঁড়ালো আঠারোয়। গিরিবালা তখন রীতিমত একজন মহিলা-নেত্রী। পাড়ার মেয়েদের সে চঞ্চল করে’ তুলল। মেয়েদের মধ্যে সে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, দেশ-বিদেশে পথে-ঘাটে জাগ্রত নরনারীর যে বিচিত্র আনন্দ ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে, খবরের কাগজ পড়ে’ পড়ে’ গিরিবালা তার বন্ধুদের সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। মেয়েরা শোনে অবাক্‌ হয়ে।’

অমলা কহিল, 'আমার মনে হয় গিরিবালা বুঝেছিল, প্রচারের কাজ মেয়েরা যতদিন না হাতে নেবে ততদিন কোনো উপায় নেই!'

সুরেন বলিল, 'কি জানি, গিরিবালা তখন ভাবে স্বদেশের কথা, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। বর্ত্তমান সমাজবিধিকে নিয়ে সে নাড়াচাড়া করে। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েদের কাজ করতে হবে এ কথা সে যেন কেমন করে' বুঝতে পেরেছিল। মেয়েদের হাতে দিল সে চরকা, চাঁদা তুলে একটা বাড়ীভাড়া করে' সে বসালো তাঁত! গৃহশিল্পের উন্নতির কথায় তার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত অমলা-দি। কিন্তু অনেক গেরস্থর মেয়ে তার এই সৌখীন জীবন-বিলাস দেখে গোপনে ও প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগ্‌ল!'

অমলা কহিল, 'শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ! আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি গিরিবালার চরিত্র-সম্বন্ধে তারা কলঙ্ক রটাতেও ছাড়েনি। মেয়েদের চরিত্রে বদ্‌নাম প্রথমে কা'রা দেয় জানো সুরেন? মেয়েরা!'

সুরেন অল্প একটু হাসিল, 'তারপর বলিল, 'দিনরাত গিরিবালার পরিশ্রমের আর কামাই নেই। সাধারণ গেরস্থ মেয়েদের অনভ্যস্ত অনেক কথা আর অনেক কাজ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হতো। একদিন সে আমাকে বলেছিল, রাতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, সমস্ত দেশ ছেয়েসবল সুস্থ ও কর্ম্মঠ নরনারীর

শোভাযাত্রা চলেছে, আর সে রয়েছে তাদের পুরোভাগে'। আমি তার স্বপ্ন শুনে হাসতাম অমলা-দি। কিন্তু তবু তাকে দেখে অনেক কথা মনে হতো সেই সময়টায়। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা ছিল তার মধ্যে। একটি মহিমান্বিত রূপকে মনোহর করে' ফুটিয়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তার অন্তরে। গিরিবালার প্রথম বয়সের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের মধ্যে যে কাজের প্রেরণা ছিল, সবাই চমৎকৃত হয়েছিল তাই দেখে। গিরিবালার জীবনে এত উচ্চ আশা ছিল যে সে সব সময়ে মাটিতে পা ফেলে হাঁটত না।'

অমলা কহিল, উচ্চ আশাটা মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। ও তারা ত্যাগ করতে পারে না ভাই।' বলিয়া সে একবার উঠিয়া গেল। ডাল নামাইয়া সে তরকারি চ[illegible] দিল। তারপর বলিল, 'মাছ-মাংসের সুবিধে আমার ক[illegible] নেই, তা জানো ত? আমি দারুণ নিরামিষভোজী!'

সুরেন কহিল, 'আমারো ওটা অভ্যেস নেই। মা'র নিরামিষ রান্না খেয়ে আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। মাছ-মাংসের আস্বাদ প্রায় ভুলতে বসেছি।

অমলা উঠিয়া আসিয়া আবার বিছানার উপর বসিল। তারপর হাসিয়া বলিল, 'অভ্যেসটাই আসল, স্বভাব বলে' কিছু নেই ভাই।'

সুরেন কহিল, 'তোমার কথাগুলো মন মেনে নেয় না কিন্তু শুনতে ভাল লাগে।' বলিয়া সে বিছানার একধারে গড়াইল।

অমলা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'কতবার তোমায় বললাম, বিয়ে কর; তোমার বউ থাকুক আমার কাছে, তুমি ভাই শুনলে না!'

'আমি ত বলিনি যে ভীষ্মদেব হয়ে থাকব!'

'বলনি কিন্তু কাজে তাই করছ!'

সুরেন কহিল, 'বিয়ে করে' সংসার না হয় চালাতে পারব কিন্তু তাকে এনে রাখব কোথায় বল ত?'

'কেন?'—অমলা বিস্মিত হইল।

'না অমলা-দি, তুমি এখানকার কথা বলো না! এখানে এনে এদের সঙ্গে তাকে আমি মিশতে দিতে পারব না। এদেশের ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না, তার মানে, তারা সবাই হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেনি, বরং তার উল্টো। তারা চায় সুন্দর গৃহ, আদর্শ পরিবার, উদার সমাজ, সুশৃঙ্খল জীবন। এ তারা পায় না। এখানে যারা রয়েছে তারা বসে' বসে' শুধু মৃত্যুর দিন গোণে, তাদের মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা কারো নেই!'

অমলা কহিল, 'তুমি বিয়ে করে' আলাদাও ত থাকতে পারো।'

'পারিনে।'—সুরেন কহিল, 'ত্যাগ করে' কতদূর যাবো? কোথায়ই বা যাবো? সবাইকে ত্যাগ করে' যে বাঁচা, তুমি তাকে বাঁচা বল? বিষ খেয়ে যারা মরতে বসেছে তাদের ছেড়ে চলে' যাওয়া শুধু স্বার্থপরতাই নয়, সেটা নিয়মেরও বিরুদ্ধ।'

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। ঘরের মধ্যে শুধু সোঁ সোঁ করিয়া জ্বলন্ত ষ্টোভের শব্দ হইতে লাগিল। রাত্রি নিতান্ত অল্প হয় নাই। সুমুখের কুলুঙ্গিটার উপর একটা টাইম্‌পিস্ ঘড়িতে টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। ঘরখানির চারিদিকে যেমন পরিচ্ছন্নতা, তেমনি একটি নারীর স্নেহস্পর্শের সুশৃঙ্খলা সকল জায়গায় সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

অমলা বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা মেলেনা ভাই। যাক্, তারপর বল শুনি তোমার গিরিবালার কথা।'

খানিকক্ষণ থামিয়া সুরেন বলিতে লাগিল, কিছুকাল পরে আবার গিরিবালাকে দেখলাম। শহরতলীর কোনো এক নির্জ্জন পল্লীতে সে আত্মগোপন করেছে। আশপাশের সমারোহ তার তখন গেছে ভেঙে; উদ্দাম স্রোত হয়ে এসেছে স্তিমিত। গিরিবালাকে আমি নতুন করে' আবিষ্কার করলাম অমলা-দি। আমি যেতেই ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়াল, মাথায় সিঁদুর। দিব্যি গেরস্থ ঘরের বউ। বললাম, 'তিন বছরের মধ্যেই এই? মেয়েদের স্বাধীনতা-আন্দোলন বোধ হয় বিয়ে পর্য্যন্ত, না গিরিবালা?'

গিরিবালা একটুখানি হাস্‌ল, বল্‌ল, 'ভাল ত' সব?'

'বল্‌লাম, 'মোটেই না, অনেক মেয়ে ছিট্‌কে বেরিয়েছে, তোমাকে তারা চায়।'

'আমাকে?' গিরিবালা আবার হাস্‌ল, হেসে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌ল, 'আমি ফুরিয়ে গেছি।' বল্‌লাম, 'গিরিবালা, আগুন নিবে গেলে আবার জ্বাল্‌তে কতক্ষণ?' গিরিবালা বল্‌ল, 'জ্বাল্‌বে ত, কিন্তু জ্বল্‌বে কি? সবই যে ছাই!'

'প্রতিবাদ করতে গেলাম অমলা-দি, গিরিবালা দিল থামিয়ে। বল্‌ল, 'বুঝেছি কি বলতে চাও, কিন্তু কি করব বল! বিয়ে করব না, এ কথা বলবার জোর আমাদের আজো হয়নি!'

'সেই গিরিবালা! যে-আকাশের নীচে ছিল তার মুক্ত জীবনের লীলাভূমি, সে-আকাশ তার আজ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সূর্য্যের আলো আসে অতি সন্তর্পণে, বাতাস আসে চুরি করে'। সমস্ত শহরে যে দাপাদাপি করে' বেড়াতো, আজ সে রাস্তাঘাট পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। একদিন যে মানুষটি সকলের পথ দেখিয়ে দিত, পরিচয় না দিলে আজ তাকে আর চেনবার উপায় নেই। গিরিবালা মাথা হেঁট করে' রইল।'

অমলা কহিল, 'তার স্বামী?'

'স্বামিটি তার সাধারণ চাকুরে, চাকচিক্যহীন। সামান্য বর, সামান্য উপার্জ্জন। তবু বুঝলাম গিরিবালা সন্তুষ্ট। মনের মতন

ঘর পেলে মেয়েরা আর কিছু চায় না! আমার মনে হয় আজকের এই নারী-আন্দোলনের মূলে একটা কথা আছে, সেটা যে সবাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই চায় তা নয়, সেটা হচ্ছে মেয়েরা মনের মতন সংসার পাচ্ছে না বলে'। সেই জন্যেই মেয়েদের এই আন্দোলনটা প্রতিবাদের মতন শোনাচ্ছে।'

অমলা বলিল, 'তারপর গিরিবালার—?'

সুরেন বলিল, 'হ্যাঁ, আকাশ যেমন ছোট্ট একটি বাসার স্বপ্ন দেখে, গিরিবালার মুক্ত বিহঙ্গ-মন সমস্ত কাজের উত্তেজনার পাশে হয়ত এই নীড়টুকুই রচনা করেছিল বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন দিয়ে, মায়া দিয়ে, কামনা দিয়ে। বললাম, 'সে সবের পরিণাম কি এই গিরিবালা? গিরিবালা বললে, 'মন্দ কি, বাঙালীর মেয়ে হয়ে যে কাজটুকু করে' এসেছি তারই রেশ চলবে এখন অনেক দিন।' লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল অমলা-দি'। সুমুখে যার কিছু নেই, পিছনের কীর্তিই হয়ে ওঠে তার কাছে বড় পুঁজি। গিরিবালার অহঙ্কারই হল' গিরিবালার দৈন্য! মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সে বললে, 'খরচ লিখে দিও।' বললাম, 'তা ত' দিতেই হবে, মাথায় সিঁদুর উঠলেই মেয়েরা খরচ হয়ে যায়, একথা সবাই জানে।'

'কথায় কথায় গিরিবালা বললে, 'আমার বিশ্বাস, সংসার আমি ভাল করেই করতে পারব। ভাল করে' সংসার চালানোও

একটা মস্ত বড় কাজ!' তা বটে! যে মেয়ের যৌবন থেকে সমারোহ চলে' গেল, কাজের উৎসাহ গেল থেমে, নারীর শেষ আশ্রয়টুকুকে সে যে এমনি করেই আঁকড়ে ধরবে এ আর বিচিত্র কি! গিরিবালার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম না অমলা-দি'। তবু ইতিমধ্যে ছোট্ট একটি নাটুকে ঘটনা ঘটল। চলে' আসছি, ভেতরে কচি ছেলের কান্নার আওয়াজ শুনে হঠাৎ সে একবার শিউরে উঠে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, মুখে তার যেন কে একপোঁচ্ কালি বুলিয়ে দিয়েছে। কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে, লজ্জায় সে অধোবদন হয়ে রইল।'

অমলা কহিল, 'ছেলে হয়েছে, এতে লজ্জার কি আছে?'

সুরেন বলিল, 'আমিও তাকে বললাম, 'এ অত্যন্ত স্বাভাবিক।' তখন একটুখানি সরে' এসে গিরিবালা বল্‌ল, 'দাঁড়াও, এ কথা কিন্তু মনে করে' যেতে পাবে না যে নিজেকে ঢাকবার জন্যেই এত কথা বললাম। আমি বিশ্বাস করি বিয়ে করলেই মেয়েরা মরে না!' তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে এলাম অমলা-দি, গিরিবালার চোখ ছল্ ছল্ করে' উঠেছে। গিরিবালা সমুদ্র ছেড়ে এল সরোবরে, প্রান্তর ছেড়ে প্রাঙ্গণে।' বলিয়া সে একবার চুপ করিয়া গেল।

অমলা উঠিয়া আসিল। তরকারিটা নামাইয়া ফেলিয়া এবার সে এলুমিনিয়মের একটা পাত্রে চাল ও জল দিয়া ভাত চড়াইয়া

দিল। বলিল, 'তোমার একটু দেরিই হয়ে গেল ভাই,—হ্যাঁ, তারপর? আবার কবে দেখা হল'?'

গল্পের সূত্র টানিয়া সুরেন বলিল, 'তারপর অনেক কাল আর দেখা নেই।'

বিছানার উপর উঠিয়া অমলা আবার বলিল, 'বল।'

সুরেন কহিল, 'সেবার সমস্ত দেশ জুড়ে উঠেছে রাজনীতির ঢেউ। দেশপ্রীতির আলো জ্বলে' উঠেছে ঘরে ঘরে। সে আলো কোথাও কোথাও আগুন হয়ে লোকের আরামের শয্যা পুড়িয়েছে। স্ত্রী-পুরুষে ছুটে নেমে এসেছে পথে-ঘাটে। শহরের পথে-পথে নেমেছে মেয়েদের শোভাযাত্রা। সে দৃশ্য অবাক হয়ে দেখবার মতন। কিন্তু বহুদিন আগেকার কোনো অলক্ষিতা নারীর প্রেরণা যে সেই নারী-আন্দোলনের মূলে থাকতে পারে একথা সেদিন কারো মনেই এল না! ছুটলাম গিরিবালার কাছে। তাকে যে আজ বড় দরকার! এ জয়যাত্রায় সে কি সামান্য অংশটুকুও নেবে না? এতে তার অধিকার যে অনেকখানি!'

অমলা একটু মলিন হাসি হাসিল।

সুরেন বলিতে লাগিল, 'বোশেখ মাস, খররোদে চারিদিক ধূ ধূ করছে। এক দরিদ্র নগণ্য পল্লীতে তাকে আবার আবিষ্কার করলাম। অনেকবার বাড়ী বদল করে' এখানে এসে সে থেমেছে। প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি অমলা-দি,—হ্যাঁ, তাকে চিনতে পারা

একটু কষ্টকর বৈকি। অনেকদিন কেটে গেছে কিনা! চেয়ে দেখে মনে হল', হা ভগবান, এই কি তার রূপ? গিরিবালা যে কোনোদিন সুন্দরী ছিল, গল্পচ্ছলে একথা বললেও লোকে শুনবে না। শুধু দেখতে ভাল নয় বললেও তাকে সম্মান দেওয়া হয়! গিরিবালা কুৎসিত, কদর্য্য! শুকনো তোব্‌ড়ানো একখানি মুখ, অস্থিসার দেহ, কাঠির মতন দু'খানা রোগা রক্তহীন হাতে শাদা দু'গাছা শাঁখা, দেহের লজ্জায় অতি কুন্ঠিত হয়ে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিবালা হাঁপাতে লাগ্‌ল।

'এতদিন বাদে যে? কি দরকার?'—এই হল' তার প্রথম প্রশ্ন। আসল কথাটা ভুলে গেলাম। কি তাকে বল্‌ব? কিই বা বলবার ছিল? বললাম, এমনি এসেছিলাম এইদিকে, তাই একবার—' সে বল্‌ল, 'ওঃ—এই!' গোটাকতক উলঙ্গ অপোগণ্ড কুৎসিত ছেলেমেয়ে এসে তাকে ঘিরে বিবাদ ও বায়না জুড়ে দিল। কোনোটার সর্ব্বাঙ্গে মাদুলি, কারো চোখ ট্যারা আর মাথায় ঘা, কারো বাঁ পায়ে লোহার বালা, কেউ বা 'বাবা তারকনাথের জন্য মাথায় চুল রেখেছে। ছোট ছেলেটা এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল, 'দেখবেন কুব্‌লি কেমন দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে রয়েছে? ওই যে—' বলে' সে আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতর দেখিয়ে দিল। পাশ থেকে বড় মেয়েটা বল্‌ল,

'মিয়্গি, সত্যি বল্‌ছি, মা বলে ও মিয়্গি!' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম্ আট্‌কে যাচ্ছিল। বললাম, 'তারপর? কেমন আছো গিরিবালা?

'উত্তরে সে থক্ থক্ করে' কাস্‌তে লাগ্‌লো। কাসির ধমকে গায়ের হাড়গুলি তখুনি বুঝিবা পাৎলা মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। চোখে তার জল এল কাসতে কাসতে। ধরা গলায় বল্‌ল, 'থাকা আর কি, গেলেই হয়!' বললাম, 'হাঁপানি বুঝি?

'কি জানি কি রোগ, ক'দিন একটু বেড়েছে।'

'খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে চলে' আসবার সময় বললাম, 'কোনো কথাই খুঁজে পেলাম না গিরিবালা।'

'ধোঁয়াটে কথা গিরিবালা কখনও সইতে পারে না। মুখের দিকে তাকাল। বল্‌ল, 'খুঁজ্‌তে হবে কী এমন ক' ? এলে যদি বলেই যাও না?' বললাম, 'এসব তোমার ল লাগ্‌চে গিরিবালা?'

'গিরিবালা বল্‌ল, 'কোন্ সব? ও, এই কথা! কিন্তু সংসার করতে গেলে—' বলে' একটু ম্লান হাসি হাসতে গিয়ে সে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে' গেল। সেই শেষ অমলাদি, গিরিবালার সঙ্গে সেই হল' আমার শেষ দেখা!'

অমলা একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া

রহিল। ঘরের ভিতর যেন একটা বুকচাপা বাতাস রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সে আর কথা কহিল না।

সুরেন বলিতে লাগিল, 'স্বামীটাকে চিনতাম, গিরিবালার স্বামী। এই ক'দিন আগে পথে আসতে আসতে লোকটার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'ভাল ত সব ?' সে বল্‌ল, 'আর ভাই, বড় অশান্তিতে কাটছে, ঝামেলার একশেষ! বললাম, 'কি হল' কি ?' সে বল্‌ল, 'মেজ মেয়েটা আবার বিছানা নিল! বেরিবেরি একবার ধরলে কি আর ছাড়ে!'

বললাম, 'গিরিবালা কেমন আছে ?' বলতেই লোকটা আপাদমস্তক আমার দিকে তাকাল, তারপর বল্‌ল, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে না ত যে রসিকতা করছ? ছিলে কোথায় এতদিন?' আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বল্‌ল, 'সে ত আর নেই!' ভয়ে আমি চীৎকার করে' বললাম, 'কে নেই?' লোকটা বিদ্রূপের ভঙ্গী করে' বল্‌ল, 'ন্যাকা, তোমাদেরই পাড়ার মেয়ে গো, তোমার গিরিবালা!' চোখের জলে গলা আমার বন্ধ হয়ে এল অমলাদি। বললাম, 'তার মানে?' লোকটা চলে' যাবার সময় বলে' গেল, 'মানে ফর্সা! পেটের মধ্যে যক্ষ্মা, যমে ছুঁয়েছিল যে! যাই, আবার ওই ফটোগ্রাফারের দোকানে যেতে হবে, ছবিটা তার বাঁধাতে দিয়েছি!"

অমলা বিছানা হইতে নামিয়া গিয়া বলিল, 'বাঁচা গেল। গিরিবালা তাহলে' মাথার সিঁদূর মাথায় করেই নিয়ে গেছে!'

রুদ্ধকণ্ঠে সুরেন শুধু বলিল, 'হ্যাঁ অমলাদি। মরেছে, কিন্তু এ তার আত্মহত্যা।'

চাবি টিপিয়া অমলা ষ্টোভের আঁচ নিবাইয়া দিল। তারপর বলিল, 'এটাই একমাত্র ঘটনা নয় ভাই, এ একটা উদাহরণ মাত্র। এসো, ভাত বেড়ে দিই।' বলিয়া সে ভাত বাড়িবার আগে একবার উঠিয়া গিয়া দরজাটায় খিল বন্ধ করিয়া আসিল।

সেদিন অনেক রাতে সুরেন চলিয়া আসিবার সময় অমলা বলিল, 'তুমি ত বললে গিরিবালার কথা? আচ্ছা, আমি একটা তোমায় গল্প শোনাবো, আজ দিন আষ্টেক ধরে আমাদের এই পাশের বাড়ীর তারাপদবাবুকে লক্ষ্য করছি, ওঁদেরই গল্প!'

সুরেন কহিল, 'ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি জানি নে।'

'আমি অনেকটা জেনেছি, ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটে গেছে; পরশু আমার ছুটি আছে, এসো, বলব।'

সুরেন একটু হাসিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

*

* *

কলরব

দুপুরবেলা খানিকটা সময় মেয়েদের হাতে কোনো কাজ থাকে না। কাজ যে থাকে না তাহা মেয়েদের কথালাপ শুনিলে সহজেই বুঝা যায়। দামিনী লুকাইয়া লুকাইয়া বামুন-বাড়ীর দোতলায় আসিয়া উঠিল।

সুমুখে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহার দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'বড় পিসিমা, আপনি নাকি আমার নিন্দে করছিলেন ?'

মেয়েদের জটলা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। পিসিমা বলিলেন, 'নিন্দে আর কী বাছা, তুমি সোয়ামি নিয়ে ঘর করছো, ছেলেপুলে নেই, অবস্থা সচ্ছল, আমাদের কি চোখ টাটায় না মা ?'

সকলে নানা শব্দের নানা হাসি হাসিয়া উঠিল। পিসিমা বলিলেন, 'তা' পরে বলি শোন বাছা, তুইও শুনে যা, দুর্গা-দাসের বৌ-এর গুণ বেরুচ্ছে দিনকে দিন। মিটমিটে ডা'ন মা, ভেতরে ভেতরে গলদের খনি, সোয়ামির পকেট থেকে ছাখ্-সাক্ষেত্ সেদিন পয়সা চুরি করল। ও... কি হবে মা !'

উকীলবাবুর স্ত্রী বলিলেন, 'ঘরের বৌকে সাবধান হতে হয়। কালো চাটুয্যের বড় মেয়ে ভাসুরের কি একটা কথায় হেসে উঠে-ছিল বলে' এজন্মে তাকে কেউ ঘরে নিল না, এত বড় আস্পর্দ্ধা ?'

দামিনী অবাক হইয়া বলিল, 'কি আশ্চয্যি !

'আশ্চয্যি কি লা ? ভদ্দর ঘরের বউ, ভাসুরের কথা শুনে গলা উঁচিয়ে হাসবে ?'

'হাসলেই বা, তা'তে কি হল ?'

এত বড় সহজ কথার আর কোনো প্রতিবাদ নাই। মেয়েরা স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। এ ছুঁড়ি বলে কি ? কিন্তু একথা কেহ জানিল না, দামিনীর মনে খোলা আকাশের হাওয়া বয় ; অরণ্যের বিচিত্র আনন্দ সেখানে গুঞ্জন করে ; উদয়াস্ত সেখানে রঙ ও আলোর খেলা। দামিনীর জীবন জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ নয়।

'উঠি পিসিমা।' বলিয়া দামিনী আর সেখানে বসিল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। পিছনের যা মন্তব্য সেটা তাহার কানে গেল না তাই রক্ষা।

এ-দরজা হইতে পথে নামিয়া সে আবার ও-দরজায় গিয়া উঠিল। সুমুখে অল্প একটুখানি রোয়াক, বাঁ-দিকে কলতলা। দালান পার হইতেই একটি মেয়ের সহিত তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ইহাকেই সে খুঁজিতেছিল, ইহার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া সে প্রায়ই একবার করিয়া সংবাদ লইতে আসে। জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন রে ?'

মেয়েটির মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, শুধু ঘাড় নাড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোল দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া আসিল।

কলরব

'ভাল নেই? ডাক্তার কি বলেন?' দামিনী জিজ্ঞাসা করিল।

কি একটা উত্তর দিতে গিয়া মেয়েটি পাশের ঘর হইতে কাসির শব্দ শুনিতে পাইল এবং সে-শব্দ শুনিয়াই দ্রুতপদে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

দামিনী সেইখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া চারিদিকে একবার তাকাইল। আসন্ন শোকের ছায়ায় সমস্ত বাড়ীখানা থম্ থম্ করিতেছে। দারিদ্র্যের একটি রিক্ত রূপ চারিদিক হইতে যেন জানাইতেছে, নাই নাই, কিছু নাই। আয়ু নাই, অর্থ নাই, আনন্দ নাই, স্বাস্থ্য নাই! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দুই পা অগ্রসর হইয়া সে দেখিল, সেই মেয়ের একটিমাত্র শিশুসন্তান ম্যালেরিয়া জ্বরে অচেতন হইয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে। পাশের ঘরে শাশুড়ী শয্যাগত, রান্না করিতে গিয়া তাঁহার পা পুড়িয়া গিয়াছে। একটিমাত্র অল্পবয়স্ক দেবর আছে, কিন্তু সে তার চৌর্য্যপ্রবৃত্তির জন্য অনেকদিন হইতেই বাড়ী-ছাড়া হইয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে আসে, এটা-ওটা হাত সাফাই করিয়া আবার পলাইয়া যায়। সেদিন সংবাদ রটিয়াছিল, সে নাকি পুলিশে ধরা পড়িয়াছে।

মেয়েটি যখন আবার বাহির হইয়া আসিল তখন সে আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না। একবার এদিক ওদিক সে

তাকাইল, এবং আস্তে আস্তে দুইবার নাম ধরিয়া ডাকিয়া যখন সত্যই বুঝিল দামিনী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে একটি নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসের বাতাস যে কি কথা কহিয়া গেল তাহা মেয়েটির অন্তরাত্মাও বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বেলা তখন অনেকখানি গড়াইয়া গিয়াছে। পিছন দিকের দরজা দিয়া ঢুকিয়া দামিনী ডাকিল, 'বড়মা ?'

উপর হইতে গলা বাড়াইয়া একটি মহিলা বলিলেন, 'কে রে, ক্ষুদে বৌ ? আয় মা।'

দামিনী উপরে উঠিয়া গেল, তারপর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া প্রথমেই বলিল, 'বাঃ, এই যে স্থরেনদা, একেবারে লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে বসে রয়েছ ! দেশের কাজে নেমে আবার যে মায়ের আঁচলের তলায় ?'

স্থরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'মুখে যে খুব দেখছি, জেলে যেতে পারো ? তোমার মতন কত মেয়ে আজকাল—'

দামিনী বলিল, 'দূর, আমার মতন একটিও নেই, আমাকে নিয়ে চল ত দেখি, পিকেটিং করে' বিলিতি কাপড়ের বাজার একেবারে বন্ধ করে' দেবো।'

বড়মা বলিলেন, 'সীতেশ কি করছে রে ?'

দামিনী বলিল, 'হাড় ভাজা ভাজা করছিল এতক্ষণ, এবার ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম। পুরুষমানুষ বাড়ীতে বসে থাকলে ভারি বিপদ বড়মা!'

'আ পোড়ারমুখি!'

দামিনী হাসি থামাইয়া দম্ লইয়া বলিল, 'আচ্ছা বড়মা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান এত কমে' গেল কেন বল ত? তোমার ছেলেটি এমনি করে' বয়ে যাবে তুমি বসে' বসে' দেখবে?'

স্থরেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইল। বড়মা বলিলেন, কেন বল্ ত রে?'

দামিনী একচোট হাসিয়া বলিল, 'দেশের কাজে এই যে দলে দলে ছেলে নাম্‌ল, এর গোড়াকার কারণ কি জানো?'

বড়মা হাসিয়া বলিলেন, 'কি?'

'মনের দুঃখে। তোমরা এদের বিয়ে দিলে না, একটা উপায় দেখলে না, একটা হিল্লে করলে না, এরা কি করে বল ত?'

মুখ চোখ রাঙা করিয়া স্থরেন বলিল, 'বৌদি না হলে' তোমাকে আস্ত রাখতাম না। ভারি হিতৈষী!'

'আমি একটা উপায় ঠাউরেছি বড়মা।'—গলা নামাইয়া দামিনী বলিল, 'এদের বীণার সঙ্গে তুমি স্থরেনদা'র বিয়ে দাও।'

পার্টিশানের আড়ালে ওদিকের সিঁড়ির ধারে বীণা দাঁড়াইয়া ছিল। হরিণ যেমন দূরের বাঁশীর আওয়াজ উৎকর্ণ হইয়া শুনে,

বীণা তেমনি এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া ইহাদের কথাগুলি শুনিতেছিল। হঠাৎ তাহার কানে আগুনের ফিন্‌কির মতো দামিনীর কথাগুলি ঢুকিতেই তাহার অসুস্থ দেহ সে আঘাত সহিতে পারিল না। তাহার সেই শীর্ণ মুখখানি দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া বিকৃত হইয়া আসিল, সমস্ত দেহখানির খিল্ খুলিয়া গিয়া থর থর করিতে লাগিল, মাথায় উঠিল রক্ত—মনে হইল এত বড় সম্ভাবনার সুখস্বপ্ন তাহার জীবনকে যে দুর্বিসহ করিয়া তুলিবে! ধীরে ধীরে সে যখন সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল তখন তাহার দেহের অর্দ্ধেকটা অচেতন হইয়া আসিয়াছে।

সুরেন মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বড়মা বলিলেন, 'আশ্চয্যি ও মেয়ে! এতটুকু বয়সে কত সহ্যই করল! কাল যে কাণ্ডটা ঘটল তা কোনো ভদ্রঘরে কখনো হয় না মা। মা-বাপ হয়ে এতখানি লাঞ্ছনা যে পেটের মেয়েকে করতে পারে তা আমার জা া ছিল না।'

দামিনী বলিল, 'কেন বড়মা ?'

'কেন ? এদেশে মেয়ে হওয়া যে পাপ! তার চেয়ে বড় পাপ যদি সে মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়!—কাল একবারটি সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল···ছেলেমানুষ, সকল সময় কি সাবধান হতে পারে ? সমস্ত দিন খেটে খেটে সারা হয়, ওপরে উঠেছিল একটু নিশ্বেস ফেল্‌তে···পড়ে' গেল বাপের চোখে—মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা ওর মা-বাপের স্বভাব কিনা···'

সুরেন আরক্তমুখে কহিল, 'সে কী লাঞ্ছনা বৌদি, মা ধরল ঝাপ্‌টে আর বাপ···দেখে এসোগে, গায়ে এখনো দড়া দড়া দাগ পড়ে' রয়েছে।'

দামিনী কহিল, 'নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তি বড়মা? এ বীণা সইল?'

বড়মা কহিলেন, 'মেয়ে যে মা, সে যে মেয়ে, পরের অনুগ্রহে যে তাকে বাঁচতে হয়! যে পরাধীন তাকে ত মার খেতেই হবে বিনা দোষে!'

সুরেন ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বড়মা তাহার পথের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন, 'নির্দ্দোষী ত নয় মা, সুরেনের মতন অল্পবয়সী ছেলে যে-বাড়ীতে থাকে, আইবুড়ো মেয়ে হয়ে সে-বাড়ীর দিকে তাকানো, সে যে স্বদেশসেবার চেয়েও বড় পাপ!'

দামিনীর দুইটি কোমল চক্ষু ততক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কি যেন একটা গল্প করিতে আহ্লাদ করিয়া সে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তটাই সে ভুলিয়া গেল। কেহ কোথাও অন্যায় করিয়াছে শুনিলে তাহার মনের আনন্দ গ্লানিতে আবিল হইয়া উঠে, একটা অসহনীয় বেদনায় ভিতরটা তাহার টন্ টন্ করিতে থাকে।

ধীরে ধীরে উঠিয়া সে যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি

দিয়া পুনরায় নামিতে লাগিল, বড়মা আর একটি কথাও বলিলেন না, বলিবার আর কিছুই ছিল না! নিজের কথাগুলিই তাঁহার ভিতরে ভিতরে বাজিতে লাগিল।

বাড়ীতে ঢুকিবার আগে গলির পথের উপর দামিনী একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারই মাথার উপর দোতালায় তখন এ-জানালার সহিত ও-জানালার আলাপ চলিতেছে! একজন বলিতেছিলেন, 'ঠিকানা জান্‌তে চাইলাম, ছুঁড়ি কিছুতে বললে না, ফর্‌ফরিয়ে চলে' গেল!'

বড়গিন্নী বলিলেন, 'শেকলকাটা টিয়ে···বুঝতে পেরেছি ভাই, আর কিছুঁ বল্‌তে হবে না।'

'সোন্দরপানা ছুঁড়ি, গায়ের রং অমনি টক্‌ টক্‌ করছে···গলা থেকে পা অবধি খদ্দরে মোড়া···মেয়েটার আলাপ-ব্যাভার কিন্তু ভালই বড়দি, কাছে বসিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে।'

বড়দিদি বলিলেন, 'বাইরের মেয়ে মাত্তরই অমনি মিটমিটে ডা'ন্। মিটিং করা মেয়ে নাকি?'

'খুব, একেবারে জাঁহাবাজ বলতে গেলে! একবার কোন্ মাঠে দাঁড়িয়ে বক্তিতা দিয়ে দুশো ছেলেকে নিজের দলে নাম লিখিয়েছিল ···ওই ছুঁড়িই হেসে হেসে সব বল্‌ছিল কিনা!'

চক্‌চকে ছুরির মতো ঠোঁট উল্‌টাইয়া একটুখানি হাসিয়া বড়-

গিন্নী বলিলেন, 'দেখতে সোন্দর বল্লি যে! এখনকার ছেলেরা ত এদিকে—ছুঁড়ির বয়স কত?'

'তা বছর বাইশ হবে।'

'সোয়ামির সঙ্গে এসেছিল?'

'আ কপাল, তবে আর বল্‌ছি কিগো, এখনো নাকি বে-ই হয় নি!'

'অ্যাঁ, বলিস্ কি লা? ঘরে বসিয়েছিলি? তোদের কি জাত-ধর্ম্মের ভয় নেই? তুই কি ভাবিস বাইশ বছর অবধি কোনো মেয়েমানুষ......আমি [illegible] ছুঁয়ে বল্‌ছি...ছি ছি দেশের কাজ না ছাই, খ্যাংরা মেরে হারামজাদিদের মেয়ে-মদ্দানি ঘুচিয়ে দিতে হয়! কোম্পানীর রাজত্বে বাস করে' তাদের ঘরেই আগুন দে'য়া? অ্যাঁ, অত বড় মাগির এখনো ঘর-সংসার হয় নি? পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে হেসে-খুসে আলাপ করে নি ত?'

'তা কি করে' জান্‌ব দিদি, তবে যদি রাস্তায় বেরিয়ে কারো সঙ্গে—'

'সঙ্গে এসেছিল কে?'

'একটি সমবয়সী ছেলে, ভাই নয়, তবু 'দিদি, দিদি' বল্‌ছিল।'

হাসিয়া গলিয়া কুটিপাটি খাইয়া বড়দিদি কহিলেন, 'ও ভাই, এখনকার ছেলেদের ওই ধরণ, প্রথমেই 'দিদি' পাতায়! ওমা, ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা...আজকালকার ছেলেদের

মতন এমন কাপুরুষ ত আগে ছিল না…মেয়ে-ক্যাংলা, কুকুর-মুখো।’

‘ছুঁড়ি আবার একদিন আসবে বলে’ গেছে দিদি।’

‘সত্যি, মাইরি? আমার মাথা খাস্?’

‘হ্যাঁ গো, এই ভ্যাখো না কবে বলতে কবে—’

‘আমায় ডাকিস্, বিষ যদি না ঝেড়ে দি’ ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। জন্মের মতন লজ্জা দিয়ে দেবো ছুঁড়িকে। সেদিন কালীঘাটে গিছলাম তাই ফাঁকি দিয়ে এসে তোদের ভালমানুষ পেয়ে—’

‘সেদিন তোমায় নিশ্চয় ডেকে দেবো বড়দি, তুমি এসে ছুঁড়িকে একচোট শিক্ষা দিও। তুমিই পারবে।’

বড়গিন্নী গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, ‘তুই আমায় ঠিক চিনিস্ ভাই।’

দামিনীর আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না, তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত্রে একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। উত্তর দিকের জানালাগুলি দামিনী বন্ধ করিয়া দিল। আহারাদি একটু সকাল সকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি ধূপ এতক্ষণ জ্বলিয়া জ্বলিয়া এবার শেষ হইতে আর দেরি নাই। ঘরের দুইদিকে দুইটি বিছানার উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে গল্প করিতেছিল।

সীতেশ গল্প স্থরু করিয়া বলিল, 'ধর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ছোটবেলা থেকে দু'জনে একসাথে মানুষ হ'ল, তা'তে যা হয়, হ'ল প্রেম। তারপর হল' দু'জনে ছাড়াছাড়ি। মেয়েটির বিয়ে হল' অন্যের সঙ্গে, কিন্তু বিয়ের আটদিন পরেই সে মাথার সিঁদুর মুছে ফিরে এল, স্বামীর লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের দরুণ কিছু টাকাও সে পেল—বেশ, এ পর্য্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু দিন যায়, ওদিকে ছোটবেলার ভালবাসার সাথীটিও বড় হয়ে একটি বউ ঘরে আন্‌ল—'

দামিনী গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, মুখের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া বলিল, 'তারপর ?'

'তারপর দুনিয়ায় যেটি সব চেয়ে বড় সত্যি, স্ত্রীকে ঘরে এনে লোকটা বিধবাটিকে তাচ্ছিল্য ও অনাদর করল, বেচারা বিধবার তিন কুলে কেউ নেই—বেশ, তাও সয় ; কিন্তু তখন আর সয় না দামিনী, যখন আগেকার ভালবাসার ভাণ দেখিয়ে বিধবার টাকাগুলি লোকটা ঠকিয়ে নিল! আজ দেখলাম সেই মেয়েটি মেজদিদির বাড়ী ভিক্ষে করতে এসেছিল।'

দামিনী বলিল, 'এ গল্প নয় ? সত্যি ঘটনা নাকি ?'

সীতেশ কহিল, 'সত্যি এবং অতি সাধারণ!'

দামিনী উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'তবে শোনো, ওর চেয়েও একটা ভাল গল্প : মণ্টুবাবুর বউ, ওই যে গো যার সেদিন বিয়ে হ'ল—

ফিরিওলার কাছ থেকে তিন পয়সার রসমুণ্ডি ধার করে' কিনেছিল, সেই নিয়ে বাধ্‌ল ঝগড়া। বড় বোন কি যেন বলেছিল, ভাই গিয়ে বোনের চুলের মুঠি ধরে' দেয়ালে মাথা দিল ঠুকে, মা আর সইতে না পেরে ছোট ছেলেকে ডাকলেন··তারপর ভা'য়ে ভা'য়ে লাঠালাঠি···'

'সত্যি ? তারপর ?'—সীতেশ গিয়া দামিনীর পাশে বিছানায় বসিল।—'কি হ'ল দামিনী তারপর ?'

'বলি।' বলিয়া দামিনী গায়ের উপর গরম র‍্যাপারটা টানিয়া দিয়া বলিল, 'বড় বোনের কপাল গিয়েছিল ফেটে, তার বদলে ছোট ভাই মণ্টুবাবুর বাঁ-হাতখানি ভেঙে দিলেন, মা ঠেলা খেয়ে রোয়াক থেকে পড়ে' গেলেন, বুড়োমানুষ, পক্ষাঘাত হ'ল···তারপর পুলিশ এল—'

'তারপর ?'

'তারপর আর বলা চলে না।'

'কেন ?'

'আচ্ছা, শেষটাও শোনো। সবাই পুলিশের হাতে কেমন করে' রেহাই পেলে জানো ? বউটার চরিত্র-দোষ প্রমাণ করে' ! খুনেরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচ্‌ল ভদ্রঘরের মেয়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে। দারোগা দু'বার লাঠি ঠুকে কিছু ঘুস নিয়ে চলে' গেল।'

বলা বাহুল্য, সমস্ত গল্পগুলিই প্রতিবেশিগণের সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত।

রাত গভীর হইয়াছিল। পশ্চিম দিকে যে চন্দ্র অস্ত গিয়াছে তাহারই ক্ষীণ আভা জানালার ঝিলিমিলির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। এত রাত্রেও এই দুইটি স্বামী-স্ত্রীর চোখে এতটুকু ঘুমের আমেজ ছিল না। কথা কহিয়া কহিয়া শ্রান্ত হইয়া তাহারা প্রতিদিন কোন্ এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে, এবং যখন ঘুমায় তখন দুইজনের কেহই বুঝিতে পারে না।

সীতেশ আবার উঠিল। উঠিয়া এদিকের বিছানাটার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'বিলাসবাবুর ছোট ভায়ের কাহিনী শুনেছ ত—এই আজ [illegible] ইন্দ্রর সঙ্গে—আঃ আবার উঠ্‌ছ কেন?' বলিয়া সে দামিনীর গায়ের উপর চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'থাক্ আমি তোমার কাছে বসছি নে।'

দামিনী হাসিয়া বলিল, 'বসবে না বলেও ত বসতে চাইচ! —হ্যাঁ বল, ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল' তোমার?'

রাগ করিয়া সীতেশ বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই নে।'

দামিনী একটা হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, 'কথায় কথায় ছেলের রাগ! বল তারপর কি হল'?'

'আগে আমায় বসতে দাও তোমার বিছানায় ?'

'বসেই ত আছ, আবার চালাকি !'

ভাল করিয়া বসিতে গিয়া সীতেশ শুইয়া পড়িল। তারপর বলিল, 'এটা না ব'লে আর পাচ্ছি নে মিনি, শোনো···ইন্দ্রর চাক্‌রি ছিল না জান ত ? তবু বুড়ো মা মরবার আগে দিল তার বিয়ে। মায়ের শেষ অনুরোধে বেচারা বিয়ে করল কিন্তু বৌকে খাওয়ায় কি ? রোজগার যে কানাকড়িও নেই ! সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের দরজা একে একে গেল বন্ধ হয়ে···এবার স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দ্র বেরুলো পথে—'

দামিনী কহিল, 'পথে ? মানে ?'

সীতেশ কহিল, 'মানে কিছু নেই। পথে, পথের ধূলোয়, কাদায়, লোকের বাড়ীর রোয়াকে, গাছতলায়, পথ মানে মানুষের মরুভূমির ভেতর দিয়ে—'

দামিনী চুপ করিয়া রহিল। সীতেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু কোথায় যায় ? এক একটি বন্ধুর বাড়ীতে স্ত্রীকে ফেলে দিনের পর দিন উধাও হয়ে থাকে, লজ্জায় আর ফিরে আসতে পারে না। অনেক দিন পরে কোনোরকমে এক দর্জ্জির দোকানে তার একটা কাজ জুটলো, কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীতে ঘরকন্নাও করল। কিন্তু সে চাক্‌রি যখন গেল তখন তাদের একটি সন্তান আসন্ন হয়ে এসেছে !'

দামিনী বিপন্ন হইয়া বলিল, 'এই রে !'

সীতেশ কহিল, 'ছেলে হবে কিন্তু খাওয়াবে কি? স্ত্রীর কাছে ইন্দ্র কেবলই বলে, ও-মাস থেকে একটি চাকরির স্থবিধা হবে। স্ত্রী তার কথায় বিশ্বাস করে' দিন গোণে, শেষে বুঝলে উপার্জ্জন করা তার স্বামীর ভাগ্যে নেই!'

দামিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া একটি জানালা খুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। রজনী অন্ধকার। বীণাদের ছাদের মাথায় দপ্ দপ্ করিয়া একটা বড় তারা জ্বলিতেছে। আশপাশের সকলে গভীর নিদ্রায় নিস্তব্ধ। তাহার মনে হইল, রাত্রির এই দৃশ্য সত্য নয়, রূঢ় দিবালোকে যাহা দেখা যায় তাহার চেয়ে স্পষ্ট আর কিছুই নাই। অন্ধকারের যে-রূপ, সে রূপের মোহ মনকে পথহারা করিয়া দেয়। মৃদুকণ্ঠে সে শুধু কহিল, 'তারপর?'

সীতেশ উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। বলিল, 'তারপর দামিনী, ইন্দ্র আবার হ'ল' উধাও। কতদিন তার আর দেখা নেই। ফিরে যখন এল, শুন্‌লো তার স্ত্রী এক দাইয়ের বাড়ীতে রয়েছে। ছুটতে ছুটতে ইন্দ্র গেল সেখানে। দাই শুধু বললে, বড় দেরি হয়েছে আপনার আসতে। ইন্দ্র বললে, কেন? দাই বললে, প্রসব হ'তে সে পারে নি, কাল তার হয়ে গেছে, আপনি এতদিনে খবর নিতে এলেন? ঢোক গিলে ইন্দ্র শুধু বললে, আমার চাক্‌রি হয়েছে তাই আমার স্ত্রীকে বলতে এসেছিলাম।'

দামিনী মুখের একটা শব্দ অস্ফুট করিয়া উঠিল, তারপর

সীতেশের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

*

* *

ফাল্গুনের দিন আবার আসিল। ও-বাড়ীর ছাদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই শঙ্কর দেখিল, ছোট ছোট ঘূর্ণা হাওয়া ধূলার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। তাহারই নীচে আমগাছটার আগ্‌ডালে ইহারই মধ্যে কথন্ সংবাদ পৌছিয়া গিয়াছে কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। কচি কচি পাতায় ও আমের বোলে সারা গাছটা ভরিয়া গিয়াছে। এলোমেলো বাতাসে কোথা হইতে শুক্‌নো এক একটি ঝরা পাতা উড়িয়া আসিয়া জানালার কার্ণিশের কাছে খস্ খস্ শব্দ করিয়া যায়। দরজার কাছে সেই পরিত্যক্ত জায়গাটুকুতে শীর্ণ শিশুর মতো দুই একটি দূর্ব্বাঘাস টলিতে টলিতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। দুপুর বেলাকার রৌদ্রে সকল আকাশ উদাস হইয়া উঠে।

সেদিন পাড়ার কোলাহলটা হঠাৎ যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্কর ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

'—আ ছি ছি, মরণ কবে হবে তা জানি নে মা। পাড়াঘরে যে এমন কেলেঙ্কারী হবে তা কে জান্‌ত বাছা?'

কলরব

‘গলায় দড়ি মা, গলায় দড়ি! মা মাগি [illegible] পেটে ধরেছিল, আঁতুড়ে নুন খাইয়ে কেন মারে নি! বলে—‘মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই।’

‘ছোটবেলায় যে মেয়ে বিধবা হয় তার পা একবার পিছলোবেই মা।’

‘কিছুই কি খোঁজ পেলে না গা?’

‘না পিসিমা, কানে যেন কে মন্তর দিলে! কেমন যেন হয়ে গেল! অমন দুরন্ত মেয়ে···কথাও কয় না, সাড়াও দেয় না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে’ এদিক ওদিক তাকায়···’

‘মরেছে মরেছে, আর বলিস নে বাছা।’

‘হ্যাঁ মা, এ মরণই। বলেছ তুমি ঠিকই।’

‘তিন কুড়ি বয়েস হ’ল, অন্যায় কি আর বলি বাছা? ঘরের ঝি-বৌ বেরিয়ে গেলেই ধরে নিও সে মরেছে। কখন্ পালালো?’

‘ভোর রাতে মা উঠে দেখে সদর দরজা খোলা হাট। আবার ঢং করে’ বলা হচ্ছে, মেয়ে আমার পথ চিনে মামার বাড়ী গেছে!’

‘ঢং না ঢং! দুগ্‌গা দুগ্‌গা, তার কথা আর বলিস নে মা।’

‘বলি কি আর সাধে মা? এদিকে গোলমালে কান পাতবার জো নেই যে! ছেলেরা মুখ টিপে টিপে হাসচে, সুরেন-সীতেশ ওরা সব খুঁজতে বেরিয়েছে, ডাক্তারবাবু খবরাখবর কচ্ছেন।

আমরা বুড়ো মাগী, তবু লজ্জায় আমাদেরই মুখ দেখানো ভার হয়েছে।'

'তা ভাই সত্যি কথা, সব মেয়ের মন যে একদড়িতে বাঁধা।'

বড় গিন্নী একটা মেয়েলি অশ্লীল কথা সকলকে শুনাইয়া দিলেন।

নববসন্তের সকল রূপ সকল ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে শঙ্করের দৃষ্টি হইতে ছায়াবাজির মতো মিলাইয়া গেল। সে নাই! সে চলিয়া গেছে! দিনের আলো এবং রাত্রির অন্ধকার পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল।

দূরে নারিকেল কুঞ্জের ওপার হইতে তপ্ত হাওয়া ছুটিয়া আসিয়া আমের বোল্‌ ফুটাইয়া চলিয়া যায়। সজিনা ফুলের ডালে মৌমাছির দল আসিয়া ঘুর ঘুর করিতে থাকে।

সে নাই! বেদনাহত সমস্ত রিক্ত নীলাকাশ এই কথাটিতে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে! কে তাহাকে এমন করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল? নদী? আকাশ? তেপান্তরের মাঠ? তাহার ক্ষুদ্র বুকের রক্তে এত বড় আহ্বান জাগাইল কি ওই শিমুল গাছের রক্তাক্ত ফুলগুলি?

দিনের শেষে শঙ্করের ঘরে ধীরে ধীরে অন্ধকার দল পাকাইতে লাগিল। আলো এখনও জ্বালা হয় নাই, ঘরে সে আলো

জ্বালিবে আর কোন্ প্রয়োজনে? দেয়ালের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সে চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। এক এক ঝলক বাতাস মাঝে মাঝে ভিতরে ঢুকিয়া শব্দ করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

সে নাই! এ যেন প্রকাণ্ড না-থাকা! বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদটা নিজের ভিতর হইতে তাহাকে শুনিতেই হইবে। কোথাও সে নাই! এ ত' শুধু তারই চলিয়া যাওয়া নয়—ঋতুরাজকে সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, চামেলী-চম্পক-যূথী-বেলার সমারোহ গিয়াছে, ব্যর্থ বাতাস হা হা করিয়া মরিয়া গেছে, নদীর স্রোতও গেছে তার পিছনে পিছনে।

যাইবার সময় তাহার পোষা বিড়ালটির গলা ধরিয়া হয় ত বলিয়া গিয়াছে, চললাম মিনু, আমায় যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াস্ নে। কালাচাঁদ পুতুলটিকে হয় ত জন্মের মতো যত্ন করিয়া বাক্সের মধ্যে ঘুম পাড়াইয়া গিয়াছে। হয় ত অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত পিতামাতার পদধূলি মাথায় করিয়া লইয়া গেছে। সজল কালো দুইটি গভীর দৃষ্টি তুলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া সংসারের দিকে চাহিয়া হয় ত বা বলিয়া গিয়াছে, সুখে থেকো তোমরা। তোমরা দুঃখ দিয়েছ, অপমান করেছ, কিন্তু কায়মনে প্রার্থনা করে' যাই, তোমরা শান্তিতে থেকো।'

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। খোলা জানালা দিয়া দূরে সুনিবিড় তামসী রাত্রির দিকে সে

একবার দৃষ্টি ফিরাইল। আকাশে সেদিন চন্দ্রোদয় হয় নাই। বাহিরে দিগন্ত জুড়িয়া সেই অন্ধকার নিশীথিনী লক্ষ নক্ষত্রের দীপমালা জ্বালাইয়া কাহার পথের দিকে তাকাইয়া যেন বসিয়া রহিয়াছে। চোখে তাহার অগণ্য অশ্রুবিন্দু। সে নাই!

আবার ঠিক যেমন তেমনিই। তেমনি কলরব, তেমনি নিত্য নিয়মিত জীবনযাত্রা। ঘটনাটা ভুলিতে কাহারও দেরি লাগে না।

বামুনদিদি-ছোটপিসি প্রমুখ তেমনি পরনিন্দা এবং পরচর্চ্চা চলে। সন্ধ্যা হইলেই রোহিণীবাবুর সেই একঘেয়ে কাসির আওয়াজ উঠিতে থাকে। উকীল গোকুলবাবুর স্ত্রীর সেই অলঙ্কার সম্বন্ধীয় বিক্ষোভ-দাহন শোনা যায়। কবিরাজ মহাশয় গঞ্জিকা সেবনান্তে সুর করিয়া ভগবৎ গীতা পড়িতে বসেন। পুত্রহারা স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে। দুশ্চরিত্র স্বামী সতীত্বের গবেষণা করে। দারিদ্র্যের পেষণে [illegible]নবাবুর স্ত্রী ভগবানের কাছে মুক্তি চায়।

শুধু কেবল বামুনবাড়ীর ছোট ছেলেটা কোনো কোনোদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া ডরাইয়া উঠে—পলাতকা দিদি তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! শীর্ণা, নিরাশ্রয়া, পিপাসার্ত্ত! হয় ত বলিতে থাকে, মরে গেলাম, জল দে ভাই, একটুখানি জল, বড় তৃষ্ণা!

সবাই ভুলিল, ভুলিল না শুধু একটি নিপীড়িত-প্রাণ তরুণ বালক। পথের ধারে দাঁড়াইয়া লোক চলাচলের দিকে সে চাহিয়া থাকে, গঙ্গার ধারে ধারে গিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, দুপুর বেলাকার রৌদ্রে কোনো মাঠের পথে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বসিয়া ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম আসে।

*

*   *

তারাপদ ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া অনিলাকে শাসন করিতেছিল। স্ত্রীকে শাসন করা তারাপদর অভ্যাস। অনিলা প্রতিবাদ করে না এইজন্য যে, এখনকার স্ত্রীরা মনে মনে স্বামীদের অনুকম্পা করে। অনিলা অবশ্য মনোযোগ দিয়া স্বামীর শাসন শুনিতেছিল।

'ছিঃ!'

ভাঙা নড়্‌বড়ে তক্তাটার উপর বসিয়া পড়িয়া ক্ষেদোক্তি করিয়া তারাপদ বলিল, 'এই শাদা কথাটার মানে বোঝবার বিদ্যেও তোমাদের নেই। স্বাধীন মেয়ে কা'কে বলে তা জানো?'

'কা'কে গো?'

তারাপদ সম্ভবত তাহা নিজেই জানে না। বলিল, 'তাই বল, বল যে জানি নে। যেটা বোঝ না সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া

করতে যেও না। বল দেখি, স্বাধীন মেয়ে হতে গেলে সব প্রথম কি কি দরকার ?'

অনিলা বলিল, 'তুমিই বল না ?'

'ওই, তা হলেই হলো, আমার ওপরেই তা হলে ভর করতে হবে! স্বামীকে ছাড়িয়ে মেয়েমানুষের এক পা'ও স্বাধীনতা নেই। যখন তখন রাস্তায় বেরোলেই যদি মেয়েরা স্বাধীন হতে পারত, আমরা তা হলে এতদিন কাছা খুলে ফেলতাম। জানি ত, সেবার অসহযোগ আন্দোলনে—আমি নিতান্ত হেজি-পেজি পাণ্ডা ছিলুম না।'

মিনিট তিনেক নিঃশব্দে থাকিয়া তারাপদ বলিল, 'আমার অভিজ্ঞতা আছে, অনেক মেয়ে-নেতাকে আমি জানি···যাই হোক, ওসব আমি ভালবাসি নে তা বলে' দিচ্ছি অনিলা। ক'টা ধানে ক'টা চাল হয় তা অনেক স্বামীর চেয়ে আমার বেশী জানা আছে, বুঝলে ?'

অনিলা হাসিয়া বলিল, 'আগে তুমি কুমার-স্বামী ছিলে বুঝি ?'

তারাপদ হঠাৎ তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল, 'ত্যাখো, বাজে এঁড়ে তর্ক ক'র না বলে' দিলুম। একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েকে কেমন করে' টিট্ রাখতে হয়—যাও, বেশি ঘাঁটিও না, বাজে কথা ছাড়াও আমার অনেক কথা ভাববার আছে, যাও।'

অনিলা আস্তে আস্তে উঠিয়া ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর একবার স্বামীর দিকে তাকাইয়া তাহার তিন বছরের ছোট ছেলেটির খোঁজে বাহিরে যাইতেছিল, তারাপদ আর একটা কথা পিছন দিক হইতে তাহার পিঠের উপর যেন ছুড়িয়া মারিল। বলিল, 'খবরদার, এই বলা রইল, ওসব মেয়ে যদি আবার আসে তা' অমন গলা ধরাধরি করে' আলাপ করবার দরকার নেই। ওদের স্বাধীন মেয়ে বলে না, ওদের বলে বানের জল!'

যে যাহাই বলুক, একদিন কিন্তু সেই বহু প্রত্যাশিত মেয়েটি আসিল।

আকাশে সেদিন মেঘ করিয়াছে, হয় ত বৃষ্টি নামিতে পারে, বাতাস রুদ্ধ হইয়া বোধ করি ঝড়ের অপেক্ষা করিতেছিল। মেঘে মেঘে বেলা গড়াইয়া গিয়াছে।

তারাপদ নিদ্রিত। ছোট ছেলেটাও তাহার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনিলা অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিল, দরজার স্মুমুখের গলিটা আড়াআড়ি পার হইয়া সে সটান্ গিয়া ছোড়দির বাড়ীর দোতলায় আসিয়া উঠিল। স্মুমুখের বড় ঘরের মাঝখানে তখন মেয়েদের মজলিশ বসিয়াছে; একটি অবরুদ্ধ নীরবতার মধ্যে সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল। অনিলা মৃদু পদক্ষেপে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সেদিনও সে এই মহিলাটির সহিত একান্ত আত্মীয়ের মতো

আলাপ করিয়াছে, আজও দূর হইতে ভাল করিয়া একবার তাঁহার দিকে তাকাইল। তরুণীটির নাম—শৈলমণি দেবী। এই নামটি সে ছাড়া এখানকার আর কেহ জানিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিবার মতো সাহসও কাহারও ছিল না। আজ অনিলার স্পষ্টই মনে হইল, শুধু রূপ যাহার আছে তাহাকে সুন্দরী বলিয়া অভিহিত করাই নিতান্তই বিড়ম্বনা। ইঁহার কালো আয়ত দুইটি চক্ষু শিশুর মতো কেবল নিষ্পাপ এবং সরলই নয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত; বিনয়, সৌন্দর্য্য ও সলজ্জ কুণ্ঠায় যেমন তাঁহার সুন্দর মুখখানি মাধুর্য্যময় তেমনি সুশিক্ষার একটি অনাড়ম্বর ঔজ্জ্বল্যে স্নিগ্ধ। পরণে আপাদমস্তক খদ্দর, দুই হাতে দুইগাছি সোনার চুড়ি।

মেয়েটির অপরূপ রূপরাশির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনিলা চাহিয়া রহিল। মুখখানি তাহার রাঙা, কিন্তু তাহা পরিশ্রমের জন্য নয়, সে রাঙা আভাটুকু তাহার রক্তের তেজস্বীতার প্রতি[illegible]য়া। ঘন কালো চুলের খোঁপা তাহার ঘাড়ের কাছে নামিয়া আসিয়াছে! সে খোঁপাটি এত বড় যে, মনে হয়, চুলের রাশি খুলিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইলে ঘর অন্ধকার হইয়া যাইবে। অনিলা একটি কথা ভাবিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল, সে ছাড়া শৈলমণির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কাহারও নাই; শৈলমণির উপর তাহার দাবি যে কতখানি তাহা ভাবিয়া একদিকে যেমন তাহার

বুকের ভিতর উদ্বেল হইয়া উঠিল অন্যদিকে তেমনি ইহাদের প্রতি অপরিসীম অনুকম্পায় তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দিল। বড়গিন্নী, রাঙাদিদি, ছোটপিসি এবং অন্যান্য যাহারা মুখ বুজিয়া শৈলমণিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বহুদিন পূর্ব্বে দেখা একখানা ছবির কথা অনিলার মনে পড়িল। সে ছবিটি—অশোক-বনে সীতা দেবী চেড়ীর দলের মাঝখানে বসিয়া আছেন!

মনে হইল ইহার আগে কি যেন একটা আলোচনা হইতেছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া শৈলমনি খদ্দরের চাদরটি আর একবার ঠিক করিয়া লইয়া প্রথমেই কথা বলিল—সে অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর অনিলার জীবনে প্রতিদিন বাজিয়া বাজিয়া উঠিবে—বলিল, 'এরকম করে' বেঁচে থাকা আর কি করে' চল্‌বে বলুন ত? কি নিয়ে আপনাদের দিন কাট্‌ছে?'

অনিলার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

'দিকে দিকে আজ অন্ধকার ঘনিয়ে এল···মেয়েরা চিরদিন বন্দী, মাথায় তাদের অজ্ঞান আর অশিক্ষার বোঝা···তাদের একটা উপায় করুন? এ রকম করে' বেঁচে থাকার চেয়ে বিপদকে, অশান্তিকে ঘরে ডেকে আনুন।'

স্থাণুর মতো সকলে তাহার মুখের দিকে নিশ্চল হইয়া তাকাইয়া রহিল। সবাইকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে!

'ভেবে দেখুন, পাপ আমাদের মধ্যে অনেক জমেছে! অপধর্ম্মের পাপ, কুনীতি-দুর্নীতির পাপ, অশিক্ষা-কুশিক্ষার পাপ! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত আমরা যে-পন্থায় বেঁচে থাকি তা একবার ভাল করে' ভাবলে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যেত। মেয়েরা নিজেদের জীবনকে একবার ওলোট-পালট করে' দেখুক, তাদের মধ্যে কোনো শক্তি আছে কি না।'

মুখ তুলিতেই দরজার কাছে অনিলার সহিত তাহার চোখ-চোখি হইল। অনিলা হাসিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। শৈলমণি স্মিতমুখে কহিল, 'দাঁড়িয়ে যে? এসে বসুন না ভেতরে?'

অনিলা সকলের চোখের উপর দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একটি পাশে আসিয়া বসিল।

শৈলমণি আবার কহিল, 'আজ দেশের অবস্থা কি বলুন ত?'

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার মতো শক্তি ও প্রয়োজন উপস্থিত কাহারও ছিল না। দামিনী একপাশে বসিয়া এমনি একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। এবার গলা বাড়াইয়া বড়গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'বড়মা, তুমি যে সেদিন ওঁকে কি বলবে বলছিলে?"

বড়গিন্নী এবার যেন ঘা খাইয়া সজাগ হইয়া উঠিলেন! বলিলেন, 'বলবই ত, বলব না কেন বল্! বলতে আর ভয় কি?'

শৈলমণি কহিল, 'না, ভয় আজ আর কাউকে নয়। ভয় ত্যাগ করলে আমাদের অর্দ্ধেক পরাধীনতা যাবে। মেয়ে হয়ে আমরা দুঃখকে বুক পেতে না নিলে এদেশের যে আর উপায় নেই! আহার আর নিদ্রা—এ ত' জানোয়ারেরও আছে! মনুষ্যত্ব কি আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে?'

রাঙাদিদি ভিতরে ভিতরে তীব্র হইয়া উঠিতেছিলেন, বড়গিন্নী কি একটা কটূক্তি করিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতে-ছিলেন, বামুনদিদির কান দুইটা রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, ছোটবৌ কি একটা অস্ফুট মন্তব্য করিয়া দেখিয়াছিলেন কিন্তু সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় নাই; অবিনাশবাবুর স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য অল্পবয়স্কা মেয়েরা মুগ্ধদৃষ্টিতে এই অত্যাশ্চর্য্য যুবতীটির দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল।

চাঁপার কলির ন্যায় আঙুলগুলি দিয়া কপালের চূর্ণ চুলগুলি সরাইয়া শৈলমণি পুনরায় কহিল, 'কিছুই না হোক, মেয়েরা যদি আজ প্রচারের কাজটাও হাতে নেয়, তা হলেও কত উপকার। পথে পথে গান গেয়ে বেড়াবে, জাতির মনের বেদনা প্রকাশ করবে…'

বড়গিন্নীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আর কিছুক্ষণ পরে এই বৃদ্ধ বয়সেও রাগে হয় ত তাঁহার ফিট্ হইবে। কিন্তু হায় রে, ওই মেয়েটিকে আঘাত করিবার মতো সাহস, শক্তি এবং ভাষা—এই

তিনটিই যে তাঁহার নাই! যে-আলো সে জ্বালাইয়া তুলিয়াছে তাহা অন্তর-শিখা, ফুৎকারে সে ত নিবিবে না!

রাঙাদিদি প্রাণপণে ছোটপিসির কোমরে একটা চিম্‌টি কাটিলেন। ছোটপিসি নড়িয়া বসিলেন কিন্তু কথা বলিলেন না। তাঁহার তালু শুকাইয়া গিয়াছিল।

শৈলমণি আবার কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচের সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ হইল। দেখিতে দেখিতে হরিহরবাবু, কবিরাজ মহাশয়, মামা, ভাদুড়ীমশাইয়ের ভাগ্নে ভানু এবং আরও যেন কে কে উপরে উঠিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইলেন। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হইয়া কেহ পিছনের দরজা দিয়া উঠিয়া গেল, কেহ বা মাথার কাপড় টানিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিল।

'বাপরে বাপ্, রাঙাদি,' তোমার বৈঠকখানায় মেয়েদের যে মৈ-মাড়ন। এ পাড়ায় এত মেয়েমানুষ আছে' হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!'

রাঙাদিদি ঘাড় নাড়িলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কথা আসিল না। কেমন করিয়া না-জানি তাঁহার মনে হইল, এ মেয়েটির সম্মুখে এমন করিয়া কথা বলা বোধ হয় শোভা পায় না।

'কমিটিতে কি প্রস্তাব পাশ হলো গো বড়বৌ, গৃহত্যাগ করবে নাকি সবাই?'

মামা বলিলেন, 'মাইরি, যা বলেছ কব্‌রেজ, বাঁধা গরু যদি ছাড়া পায় ত সবার খামারের বেড়া ডিঙিয়ে খড় খেয়ে আসবে। ইনিই বুঝি তোমাদের সেই মিটিং-করা মেয়ে?'

কেহই তাঁহার কথায় উত্তর দিতে পারিল না, শুধু তাঁহার তাচ্ছিল্যটা সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিল। শৈলমণির মাথা হেঁট হইয়া আসিল।

হরিহরবাবু বলিলেন, 'স্বাধীন মেয়ে দেখলে আনন্দে আমার মন ভিজে ওঠে বড়বৌ, তোমার দিব্যি করে' বলছি। ভেড়ারা যখন মাঠে ছুটোছুটি করে' চরে' বেড়ায়, রাখালরা তখন মনের খুসীতে বসে' তাদের দিকে চেয়ে থাকে।—আঃ অত ফিস্ ফিস্ কচ্ছিস্ কেন রে ভানু, যা বল্‌বি চেঁচিয়ে বল্!' বলিয়া হাত ধরিয়া ভানুকে তিনি পিছন দিক হইতে সুমুখে টানিয়া আনিলেন।

সকলে ভানুর দিকে তাকাইল। শৈলমণিও মুখ তুলিল, এবং মুখ তুলিয়াই ভানুকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল। স্মিতমুখে বলিল, 'এইখানে থাকা হয় নাকি? আমি ত জানতাম না?'

ভানু তাহার কথার উত্তর দিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'তুমি সেদিন এঁরই কথা বলছিলে রাঙাদি'?'

ছোটবৌ বলিলেন, 'হ্যাঁ, ওঁরই কথা।'

ভানু ভাল করিয়া একবার শৈলমণির দিকে তাকাইল।

তারপর ঠিক যেন কাঠগড়ার সাক্ষীর মতো বলিল, 'উনি যে কুমারী তা কে বললে তোমাদের? ওঁর ত বিয়ে হয়ে গেছে!'

অকস্মাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার যেন সকলের গায়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা ভানুর দিকে তাকাইল না, তাহারা তাকাইল শৈলমণির মাথার দিকে। মাথার সিঁথির দিকে।

শৈলমণি মৃদু এবং বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'বেশ ত, সে কথা সভার মাঝখানে না বললেও ত চলে! আপনার কি এটুকু সৎশিক্ষাও নেই যে মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে হ'লে—'

ভানু তাহার কথায় দৃক্‌পাত করিল না। বলিতে লাগিল, 'উনি বিধবাও নন্, ওঁর স্বামীর কাছে আমি চাকরী করতাম, তিনি এখন কল্‌কাতার একজন মস্ত বড় ধনী। উনি দেশের কাজে নামবেন, তাই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ হয়—'

বড়গিন্নী এবার চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, তারপর?'

'ওঁর এমন তেজ যে, একদিন মাটি দিয়ে ঘষে' মাথার সিঁদুর মুছে ফেলে অমন স্বামীকে ত্যাগ করে' চলে' এলেন।'

রাঙাদিদি মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ, ভানু তুই বলিস্ কি রে? কুলত্যাগিনী?"

শৈলমণি বিন্দুমাত্র দমিল না, শুধু একটু হাসিয়া এবার কহিল, 'তা ত হল'—সবই বললেন, কিন্তু একটা কথা যে বাদ পড়ল? আপনার চাকরিটা কেন গেল তা ত' কৈ বললেন না?'

কিন্তু বর্ষীয়সী মহিলাগণের মধ্যে ইত্যবসরে একটা গোলমাল উঠিয়াছিল, তাহার কথাটা আর কেহ কানে লইল না। শৈলমণিকে এ বাড়ীতে কে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল তাহা লইয়াই তুমুল হইয়া উঠিল। ছোটপিসি হঠাৎ একটা জঘন্য অপমানের কথা বলিয়া বসিলেন। এবং তারপর যে ঝড় বহিতে সুরু করিল তাহা আর বর্ণনা করা যায় না।

যে-মাথা সে হেঁট করিয়াছিল, সে-মাথা যখন শৈলমণি তুলিল, ঘরের মধ্যে বড়গিন্নী ছাড়া তখন আর কেহ নাই। চারিদিকে ঝম্-ঝম্ করিয়া তখন বৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছে।

মুখ-ঝাম্‌টা দিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, 'আর কতক্ষণ এমন করে' বসে' থাকবে বাছা? এসোগে আজকের মতন! এসব কু-মতলব নিয়ে আর কোনো গেরস্থর বাড়ী ঢুকো না। নাও, ওঠো।'

উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকাইয়া গায়ের চাদরটি গুছাইয়া লইয়া শৈলমণি উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে চটি জুতাটি পায়ে দিয়া সে যখন নীচে নামিয়া গেল, মনে হইল, তাহার পিছনে যেন এক ভয়াবহ মৃত্যুলীলা ঘটিয়া গিয়াছে। আজ সে একাই আসিয়াছিল, একাই চলিয়া যাইবে।

কিন্তু গলির পথে নামিতেই পিছন দিক হইতে চোরের মতো

অনিলা আসিয়া তাহার একটি হাত ধরিল। বলিল, 'দিদি, আমাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।'

'তোমাকে? তোমার কোলে যে ছেলে ভাই?'

'তা হোক, আমি সব ছেড়ে যাবো তোমার সঙ্গে।'

শৈলমণি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'সে কি হয় বোন, ছেলেকে যে বড় করে' তুলতে হবে! এখন মানুষ হোক, যে-মানুষ ওদের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। আজ আসি ভাই, আর একদিন বরং লুকিয়ে আসবো তোমার কাছে।'

হাত ছাড়াইয়া শৈলমণি যখন নিতান্তই চলিতে লাগিল, অনিলা তখন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আমাকে নিয়ে গেলে না, এদের তবে ক্ষমা করে' যাও দিদি, এরা তোমায় চিন্‌তে পারে নি!'

শৈলমণি ঘাড় নাড়িয়া চলিতে লাগিল, আর পিছন ফিরিল না। সপ্‌ সপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। অনেকখানি পথ তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

বুকের ভিতর তাহার আবেগে উদ্বেল হইয়া কাঁপিতেছিল, চলিতে চলিতে দুই হাত দিয়া সে বুক চাপিয়া ধরিল। কিছুদুর গিয়া কিন্তু সে আর চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিল না। অশ্রু-সজল চোখ দুইটি উপর দিকে তুলিয়া দেশের ভাগ্য-বিধাতার

উদ্দেশে তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া কেবল একটি কথাই বাহির হইয়া আসিল, 'হায় রে দুর্ভাগা জাত !'

*

* *

নির্জ্জন দুপুর বেলাকার রোদ সেদিন চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছে। দূরে অশথ গাছটার নীচে ছোট ছোট ঘূর্ণী হাওয়ায় ধূলা উড়িতেছিল। কোথা হইতে ঘুঘুর ডাক শুনিয়া শুনিয়া আকাশটা উদাস হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারবাবু চিঠি লিখিতেছিলেন—

…অথচ প্রমীলা, তারই পাশে যে খেলা চল্‌তে থাকে তার দিকে কারো নজর পড়ে না। ওরা কেমন করে' বুঝবে, কোথা দিয়ে আসে বসন্ত-শোভা, কোথা দিয়ে যায় মানুষের দুর্লভ যৌবনের দিন।…সূর্য্যাস্তের পর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি, আকাশের সর্ব্বপ্রান্তে নক্ষত্রবালাদের সভা বসেছে। নারকেল বনের ওপার দিয়ে আসে দক্ষিণের চঞ্চল বাতাস। বকুলের ঘুমন্ত কোরক আপন পল্লব-দল মেলে জেগে ওঠে, রজনীগন্ধা নিজের গন্ধে অচেতন হয়ে দুল্‌তে থাকে। আমি কি করি? আমি বসে বসে ফুল ফোটার শব্দ শুনি, আর শুনি নক্ষত্র পতনের শব্দ, তৃণে তৃণে মৃত্তিকার ঝঙ্কার—এমনি করে' আমার দিন কাটে।

'তবু ভুলতে পারি নে প্রমীলা, সেদিন সে মেয়েটির অপমান। জান্‌লায় বসে' দেখলাম, ভূমিকম্পে পৃথিবীর মর্ম্মে মর্ম্মে কেমন করে'

চিড়্ খেয়ে গেল ! ঝঞ্ঝা এল ধেয়ে, প্রলয় করল দাপাদাপি, অপমানের প্লাবন এসে মান-সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা-মমতা, দাক্ষিণ্য-মহত্ত্ব সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনুষ্যত্বের ওপর পড়্‌ল কলঙ্কের কালি, পরার্থপরতার ওপর দিল জঘন্য ব্যঙ্গ, সৌন্দর্য্যের ওপর ফেল্‌ল কদর্য্য কুৎসার ছায়া। কিন্তু বেচারিদের দোষ নেই! তা'রা কেমন করে' বুঝবে মানুষের সত্য পরিচয় কোথায় ? সামান্য ত্রুটির জন্য যদি তা'রা উদার মহত্ত্বের টুঁটি টিপে মারে তবে তাদের কিসের অপরাধ ?'

ডাক্তারবাবু কলম থামাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। মনে হইল, একটি তরুণী মস্ মস্ করিয়া জুতার আওয়াজ করিতে করিতে চঞ্চল পায়ে উপরে উঠিয়া আসিল। সুন্দরী যুবতী, সবাই ত তাহার রূপের দিকে তাকাইয়া অবাক। পিঞ্জরাবদ্ধ জীবগুলির নিকট এ যেন বনের পাখী আসিয়া উঁকি মারিল। মেয়েটি আপন প্রাণচাঞ্চল্যে চোখে-মুখে হাসি ছুটাইয়া সবাইকে প্রশ্ন করিল, 'ডাক্তারবাবু কোন্‌দিকে থাকেন ?'

সকলে তেতলার দিকে নির্দ্দেশ করিতেই সে আবার তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল। ডানহাতি ঘর ; ভিতরে তখন ডাক্তারবাবু হাতের উপর মাথা হেলাইয়া খাটের উপর বসিয়াছিলেন।

মুখ তুলিয়া মেয়েটিকে তিনি দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটি তাঁহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'প্রমীলা, এসেছ তুমি এতদিনে ?'

প্রমীলা উচ্চরোলে একবার হাসিল, তারপর দ্রুতপদে তাঁহার পাশে গিয়া বসিয়া বলিল, 'অনেক খুঁজে খুঁজে এলাম। আমায় ভুলে থাকতে পেরেছিলে ত ?'

এতদিনকার নিঃশব্দতা আজ যেন ডাক্তারের ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। শিশুর মতো তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ভুলে ? তোমাকে ভুলে থাক্‌ব ? গায়ের রক্তকেও ত মানুষ ভুলে থাকে প্রমীলা !' বলিতে বলিতে গলা তাঁহার ধরিয়া আসিল। পুনরায় বলিলেন, 'দিন আর আমার কাটে না প্রমীলা ! প্রতিদিন মনে কী আশা নিয়ে যে বসে থাকি তা নিজেই জানি নে। কী যে খুঁজ্‌ছি, কী যে পেলাম না, কে যে সকলের থেকে আমাকে এতদূরে সরিয়ে রাখল, ঠিক কোন্ জিনিসটি আমি চাই···প্রমীলা, চোখের কান্নাটাই মানুষের বড় কান্না নয় !'

প্রমীলা তাঁহার হাতটি নিজের হাতের ভিতর লইয়া বসিয়া রহিল। বলিল, 'কি করবে এবার বল ত ?'

'কি কর্‌ব তুমি বলে' দাও। তুমি ছাড়া আর আমার অন্য উপায় নেই। তোমারই কাছে থাক্‌ব, চুপ করে' বসে থাক্‌ব, তুমি আমায় গান শোনাবে। তুমি গান শোনাবে, এমন গান, যে-গান শুনে এদের কথা ভুলতে পারি ; এদের দারিদ্র্য, দৈন্য, আত্ম-অপমান যে-গানের নীচে চাপা পড়ে যায়। প্রমীলা, এখন থেকে তুমি আমার কাজ ভুলিয়ো, বারে বারে আমার ভুল

ঘটিয়ো—প্রমীলা, তুমি আমার অভাব জানতে দিও না, তুমি আমার পরম বেদনার পথরোধ করে' থেকো। আমি যেন সমস্ত দুঃখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি।

প্রমীলার চোখে জল আসিয়াছিল। চোখে জল লইয়া হাসিমুখে বলিল, 'বেশ লোক তুমি ত, তোমাকে সাম্‌লাতে গিয়ে আমার চাকরিটা যাক্ আর কি!'

রূপ যেমন প্রমীলার ফাটিয়া পড়িতেছিল। রুমাল দিয়া সে নিজের ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি মুছিয়া ফেলিল। হাওয়ায় কয়েক গাছি চুল উড়িয়া উড়িয়া ডাক্তারের গায়ে লাগিতেছে। নারী-অঙ্গের একটি সূক্ষ্ম সুমিষ্ট গন্ধ ঘরখানির মধ্যে মায়া রচনা করিয়াছিল।

ডাক্তার বলিলেন, 'তা হোক প্রমীলা, আজ যদি ছেলেমানুষের মত কথা বলি, কিছু মনে করো না!' বলিতে বলিতে তিনি তাহার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পুনরায় কহিলেন, 'এ আর আমি পারি নে। এই রোগ, এই দারিদ্র্য, এই অশিক্ষা, এর মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। আমাকে যেখানে হোক নিয়ে চল, সুস্থ হয়ে কোথাও আমাকে বাঁচতে দাও!'

প্রমীলা কহিল, 'সকলের মাঝখানে থাকবে বলে' তুমি ত নিজেই চলে' এসেছিলে আমার কাছ থেকে।'

'সে নেশা আমার কেটে গেছে, এদের কাছ থেকে আমি পালাতে চাই!'

ডাক্তার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। প্রমীলা বলিল, 'যাবে ত, কিন্তু কোথায় যাবে ?'

'যেখানে হোক, তোমার কাছেই থাক্‌ব।' ডাক্তার পাগলের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'তোমাকে দেখ্‌ব, তোমার কথা শুন্‌বো ; স্বাস্থ্যের কথা, যৌবনের কথা, রূপের কথা—তোমাকে সমস্ত দিন ভাববো, সমস্ত মন তোমার চারিদিকে গুন্ গুন্ করে' ঘুর্‌বে—আমি আলো চাই, আনন্দ চাই—তুমি আমায় মুক্তি দাও প্রমীলা !'

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া প্রমীলা কি যেন ভাবিল। একবার একটি উদ্গত নিশ্বাস চাপিল, তারপর একটু হাসিয়া বলিল, 'তা হলে ?'

ডাক্তারবাবু মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন—'হ্যা, তা হলে' ওঠো। না, আর কোনোদিকে তাকিও না, ওসব পড়ে' থাক্। এখানকার কিছু আর ছুঁয়ো না প্রমীলা।'

প্রমীলার হাত ধরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'পেছনের সব পেছনেই পড়ে' থাক্। চল তুমি আগে আগে।'

দুইজনে বাহির হইয়া সটান্ নীচে নামিয়া আসিলেন। হতভাগ্য বন্দী গৃহস্থগুলি তাঁহাদের পথের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, 'আগে চল মাঠের দিকে। ভাল করে' একবার নিশ্বাস ফেলে আসি।'

পথে পা বাড়াইয়া নামিতেই ডাক্তার অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। চোখ রগ্‌ড়াইয়া চারিদিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন—কোথায় প্রমীলা? প্রমীলা ত আসে নাই? এ তিনি কোথায় যাইতেছিলেন? কী পাগলের মতো তিনি এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলেন? ডাক্তারবাবু যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে একবার তাকাইলেন। দুপুরের হাওয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

অনেকক্ষণ সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি আবার এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিলেন।

*

*   *

বেলা পাঁচটা বাজে।

বসন্তকালের অপরাহ্ণ, আকাশ পরিষ্কার, গাছে-পালায় রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, একটু একটু করিয়া দক্ষিণের বাতাস উঠিতেছিল।

দামিনীর ঘর আজ জম্‌-জমাট। মেঝের একধারে জলযোগের প্রচুর আয়োজন থরে থরে সাজানো। সীতেশ চায়ের সরঞ্জাম গোছাইতেছে, এইবার জল গরম করিবে। ওধারে খাটের উপর

দামিনী, আর তাহারই হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া ও-বাড়ীর বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। দামিনীর পীড়াপীড়িতে সীতেশের সহিত সে অনেকবার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই! যে-আলাপ নিষ্প্রয়োজনের সে-আলাপের শিক্ষা তাহার কোনোদিন হয় নাই।

এমন সময় ঝড়ের মতো সুরেন আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু সে একা নয়, চাদর মুড়ি দিয়া পিছনে পিছনে আরও একজন আসিয়া উঠিল। তাহাকে দেখাইয়া সে কহিল, 'বৌদি, ইনি তোমাদের নতুন অতিথি, আমার অমলাদি, এঁকে আমাদের দলে ভর্ত্তি করব।'

দামিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, 'আসুন, সুরেনদা ত আপনার কথা নিয়ে পাগল। আপনি এতদিন ধরে' এত কাছে রয়েছেন কিন্তু একদিনও আমার সঙ্গে—'

অমলা কহিল, 'আমি ভারি অসামাজিক।' বলিয়া সে হাসিল।

'মোটেই না বৌদি। অমলাদি'র সমাজ আমাদের চেয়ে বড়, তাই ওঁর দেখা পাও নি।'

দামিনী তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল, 'কিন্তু সেদিন আমাদের ছোটপিসির সমাজে আপনার আসা উচিত ছিল অমলাদি। শৈলমণি দেবীকে নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটল তা যদি আপনি দেখতেন তা হলে—'

‘সে গল্প শৈলমণির কাছে আমি সেদিন শুনলাম।’

সকলেই বিস্মিত হইয়া অমলার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, ‘আপনার সঙ্গে তার আলাপ আছে ?’

অমলা এবং সুরেন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর অমলা কহিল, ‘এ পাড়ায় কে তাকে প্রচারের কাজে পাঠিয়েছিল, বল্‌ব নাকি সুরেন ?’

সুরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, ‘তা হলে বুঝ্‌ব তোমার পেটে কোনো কথাই থাকে না !—বৌদি, কোথায় কি আছে দাও ভাই তাড়াতাড়ি, তোমার নেমন্তন্ন না রাখলে হয় ত বা—’

দামিনী চোখ পাকাইয়া বলিল, ‘তুমি কিন্তু খুব লোক যা হোক সুরেনদা, সেই কখন্ বেলা চারটের সময় আসবার কথা—’

সীতেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া খাবার গুছাইতেছিল, এবার বলিয়া বসিল, ‘দাও না কানটা মলে’—ষ্টুপিড !’

সুরেন চীৎকার করিয়া বলিল, ‘যা যা, তুই আর ব[illegible]স্ নি, বুঝলি, তুই থাম, এ আর তোমার বো’য়ের আঁচল [illegible]’ ঘোরা নয়, দুনিয়াটা অনেক বড়।’

সীতেশ বলিল, ‘ওরে ত্যাখ্ গাধা, হাটে হাঁড়ি তা হলে ভাঙ্‌বো ? এ আন্দোলনে তোর এত মেলামেশা কেন, তা হলে বল্‌ব খুলে’ আমলাদি’র কাছে ? ষ্টুপিড্, দিনে পাঁচ-সাতটা নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ানো, সেটাও কি দেশের কাজ ?’

অমলার সহিত সকলে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি ঘর-দুয়ার ছাড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সুরেন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা হলে বসি, তোর এখানকার নেমন্তন্নটাও ভাল করে' খেয়ে যাই—বৌদি, তুমি ভাই গান শোনাবে বলেছিলে!'

অমলা কহিল, 'আপনার গান শুনতেই এলাম।'

'বেশ ত, গাইবো।—সুরেনদা, এসো, তার আগে বীণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ওকি, অত লজ্জা কেন রে? নে মুখ তোল্, ও যে আমার সুরেনদা—'

অমলা অনেকক্ষণ হইতেই এই শান্ত ও নম্র মেয়েটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। বীণা মুখ তুলিতে পারিল না, সহজ হইতেও পারিল না, পাথরের মতো শীতল ও কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিতের সহিত কেমন করিয়া আলাপ করিতে হয়, ভদ্রসমাজে কেমন করিয়া মিশিতে হয়, এ ত' তাহার জানা নাই! সমস্ত মুখখানি তখন তাহার অবরুদ্ধ আত্মগ্লানিতে ও অশ্রুজলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেন কহিল, 'যাক্, এত ব্যস্ত কেন বৌদি, আলাপ হবেই এতদিন। নাও, তুমি গান ধর, অমলাদি' আবার ঘোড়ায় চড়ে' এসেছে!' বলিয়া সে হারমোনিয়মটা দামিনীর কোলের কাছে টানিয়া দিল। সবাই তখন ঘোড়ার কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

দামিনীর মনোহর কণ্ঠের সঙ্গীত যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন সকল বাড়ীর দরজা জানালাগুলি খুলিয়া গেল। সবাই দেখিল, ক্ষুদে-বৌর ঘরে অল্পবয়সী নরনারীর একটা বিশৃঙ্খল মজলিশ বসিয়াছে। সীতেশ নিজে সমস্ত জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়াছে। ছেলেপুলেদের ডাকিয়া সে সকলের হাতে দিল মিষ্টান্ন। দামিনীর আজ জন্মদিন। ও-বাড়ীর বড়পিসিমা সুমুখের জানালা খুলিয়া এত বড় অনাচারের দৃশ্যকে প্রশ্রয় দেন নাই, পিছনের খোলা জানালার ধারে তিনি স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া একালের অধোগতির কথা ভাবিতে লাগিলেন। দামিনীর কণ্ঠের গান তীরের মতো তাঁহার কানে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন সভা ভাঙিবার পর বীণা যখন বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার যে লাঞ্ছনা ও অপমান সুরু হইল, তাহার নির্দ্দয়তা দেখিয়া বোধ করি বিধাতার চোখেও জল আসিয়াছিল

এই কথা ও কাহিনীর শেষটুকু না শুনিলেই হয় ত ভাল হইত।

দামিনী আর সীতেশ ইতিমধ্যে দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গিয়াছিল নবদ্বীপে তাহাদের মামার বাড়ী। ফিরিয়া আসিয়া দামিনী যখন পাড়ায় আবার সকলের সহিত দেখা করিতে গেল, তখন আর কেহ তাহাকে আমল দিল না।

আমল না দিবার কোনো কারণই নাই। দামিনী বিস্মিত

হইয়া সেজদিদির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কহিল, ‘কেমন আছ তোমরা সেজদি ?’

সেজদিদি মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার হইয়া নিরুপমাই জবাব দিল। বলিল, ‘ছেলেমানুষী করবার সময় আমাদের নেই।’

যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সেই তরুণী স্ত্রীটির সহিত দামিনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, সেও আজ কহিল, ‘বন্ধুর মতন তোমার সঙ্গে কথা বলতাম ভাই, তোমার পেটে এত গুণ ? চলি ভাই, শাশুড়ী আবার দেখে ফেলবেন।’

দামিনী একবার বলিতে গেল, ‘কেন ভাই, কি দোষ করলাম ?’

কিন্তু তাহার কথা শুনিবার প্রয়োজন কাহারও ছিল না !

রাঙাদিদি শুনাইয়া দিলেন, ‘এটা গেরস্থ বাড়ী বাছা, ভদ্দর-লোকের মেয়েছেলে নিয়ে বাস করি। এ কাণ্ডটা তোমার জন্যেই হলো মা। তুমি বাছা আর এ বাড়ীতে ··ভাল কথাতেই বল্‌ছি।’

সকল দরজায় মাথা ঠুকিয়া দামিনীকে ফিরিয়া আসিতে হইল। নিজের কোনো অপরাধ তাহার বিন্দুমাত্র স্মরণ হইল না। শুধু বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার প্রতি একটি অতি যন্ত্রণাদায়ক বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া সমস্ত প্রতিবেশিগণ রাগে থম্ থম্ করিতেছে।

কিন্তু ঘটনাটা সেদিন তাহাকে শুনিতেই হইল। ঘরের সুমুখের জানালাগুলা বন্ধ করিয়া ঠাণ্ডা মেঝের উপর সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল, ও-বাড়ীর জানালায় বড়গিন্নীদের কথালাপ শুনিয়া সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

কে যেন একজন কহিল, 'বাপের মুখে আর কথাটি নেই, অবাক কাণ্ড, এমন কোথাও শুনেছ মা ?'

'তাই বটে, মা মাগীও বোধ হয় বাঁচবে না, সারা গায়ে পোড়ার ঘা উঠেছে।'

'মরতে মরতেও ত মেয়ের জন্যে কাঁদচে বড়দি !'

'আহা মায়ের প্রাণ, কাঁদ্‌বে না গা ? বল কি তুমি ? হাজার লাথি-ঝাঁটা মারুক, পেটের মেয়ে ত বটে।'

'তা বলে যতই মিট্‌মিটে ডান্ হোক পিসিমা, বীণা-মেয়ের সাওস কম নয় !'

'তা আর নয় বাছা, বাপের কাছে মার খেয়ে দুপুর রাতে ঘরে আগুন দিল ! যে-বাপ জন্ম দিয়েছে তার হাতের দু'ঘা চড়-চাপড় সহ্য হয় না ? এখনকার সব মেয়ের গায়েই বিলিতি গন্ধ বাছা !'

দামিনী উঠিয়া বসিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল।

একজন পুনরায় কহিল, 'সে ত' নিজেও মাথা পেতে শাস্তি নিয়ে গেল রাঙাদি' !'

'তা ত নিলই মা, গায়ে তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল—যাকে বলে, দগ্ধে দগ্ধে মরা!'

'কিন্তু তার ধৈর্য্যও কম নয়, দেখলে ত মামী, টুঁ শব্দটি কল্লে না, আহা তা ছুঁড়ি বোধ হয় বাপের কষ্টটাও বুঝেছিল, টাকার জন্যে বাপ বিয়ে দিতে পারে না—আর সে ত বলেই গেল মরবার সময়, 'আর যেন মেয়ে হয়ে না আসি।'

দামিনী গিয়া শক্ত করিয়া সীতেশের হাতটা চাপিয়া ধরিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'কে মরেছে? কা'র কথা বল্‌চে ওরা?' বলিয়া সে দ্রুতপদে আবার দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সীতেশ জবাব দিল না। কিন্তু বাহিরের কথালাপ তেমনই চলিতে লাগিল।

'মা মাগী আগুন নিবোতে গিয়ে পুড়ে আধমরা হ'ল। ওরে বাবা, যখন দম্‌কল্ এল, আগুনের আভায় পাড়াটা তখন লাল হয়ে উঠেছে—কি সর্ব্বনাশী মেয়ে মা?'

'কিন্তু আধিক্যেতা করলে ওই স্বদেশী ছোঁড়া, ওই সুরেনটা, লাথি মেরে বেড়া ভেঙে ছুটলো সোমত্ত মেয়ের গা থেকে আগুন নিবোতে। ওমা কি হবে মা! ছোঁড়ার বোধ হয় মাথা খারাপ, নৈলে এত সাহস? হাত দিয়ে আগুন নেবোনো যায়? তেমনি হয়েছে, মজাটা বাছাধন টের পেয়েছেন—দুটি হাত পুড়িয়ে হতভাগা এখন হাসপাতালে!'

'ছুঁড়িও নাকি শুন্লুম, মরবার সময় ওই ডাকাত ছোঁড়ার পা'র ধূলো মাথায় নিয়েছিল। কি হবে মা, যাবো কোথায়, নাটুকেপনা করা এখনকার মেয়ের রীত্।'

'আর সুরেনের মা'র কথা বুঝি শোন নি ছোটপিসি? বললে, 'আমি ডাকাতের মা সেই আমার ভাল!'

'ও ঢলানি মাগীর কথা আর বলিস নে মা। মাগী বলে কিনা, 'ছেলে আমার যেদিন দেশের কাজ করে' জেলে যাবে সেদিন আমার ষষ্টিপূজো হবে সার্থক। মার্ ঝাঁটা!'

দরজার কাছ হইতে সীতেশ দামিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'ওকি, শোনো, অমন করে' তাকিও না—দামিনী শুন্চ?'

'উঁ?'

'এ ঘটনা যদি তোমার জন্যেই ঘটে থাকে তবে দুঃখ করবার ত' কিছু নেই!'

দামিনী অচেতন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

কোলের কাছে তাহাকে বসাইয়া সীতেশ বলিল, 'এত বড় আত্মহত্যার তুমি প্রশংসা করলে না দামিনী? বেঁচে থাকা যে বীণার পক্ষে ভয়ানক অপমান!'

দামিনী নির্জীবের মতো শুধু কহিল, 'তাই ত!'

কিন্তু বাহিরের আলোচনা সেদিন সেইখানেই শেষ হইল না।

যেদিন তাহারা শুনিল, দামিনী খাবার লইয়া হাসপাতালে স্থরেনকে দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন তাহাদের শাদা চোখে তাহার সহিত স্থরেনের ঘনিষ্ঠতার গোপন রহস্য স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। দামিনী নিশ্চয়ই চরিত্রহীনা! অবৈধ প্রণয়াসক্তি না হইলে ঘরের বউ এমন অদম্য সাহস সঞ্চয় করে কোথা হইতে?

সীতেশ শুধু হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'মন্দ নয়, আমার বদ্‌নাম ত আগেই রটে গেছে। বীণাকে নেমন্তন্ন করে' খাইয়েছিলাম, তার কারণ, তোমার প্রতি নাকি আর আমার মোহ নেই। মোহ থাকলে কি আর তোমায় এতখানি স্বাধীনতা দিই!'

দামিনী নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অবসাদভরে তক্তার উপর বসিয়া পড়িয়া সীতেশ কহিল, কিন্তু চল দামিনী, এখানে আর না—চল, চলে' যাই কোথাও। কোনো নদীর তীরে কিম্বা পাহাড়ের কোলে ঘর বেঁধে থাকিগে। যাবে দামিনী?'

দামিনী যেন অকূলে কূল পাইল। মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'তাই চল। এখানে এমন করে' আর থাকতে পারি নে। দেখে দেখে আমার দম্ আট্‌কে আসে!'

চোখ দুইটি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

*

*　　*

শৈলমণি আবার একদিন আসিবে বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আসে নাই, অনিলা দিন গণিয়া গণিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পথের পদধ্বনির দিকে কান পাতিয়া সে আপন মুক্তি কামনা করিয়াছে, কিন্তু শৈলমণি আসিয়া পৌঁছে নাই! তাহার প্রতি অভিমানে এক একবার অনিলার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে কিন্তু সে কথা অন্তর্যামী ছাড়া আর কাহাকে সে জানাইবে?

এই জীবনে আবার যদি কোনোদিন সে শৈলমণির দেখা পায় তাহা হইলে সে তিরস্কার করিয়া বলিবে, যাহাদের কল্যাণ-কামনা ভিন্ন তোমার আর কোনো চিন্তা নাই, তাহারা তোমাকে অপমান করিল বলিয়াই যদি তুমি তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাও, তবে এমন ক্ষণভঙ্গুর হৃদয় লইয়া সংসারে তুমি কেন আসিয়াছিলে দিদি? তোমার মতো মহীয়সী নারীর এ কথাটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন, মনুষ্য-সমাজের হিতচেষ্টা লইয়া যাহারা জন্মায়, মানুষের দেওয়া অপরিমেয় অখ্যাতিই তাহাদের পাওনা!

দেখা পাইলে এই কথাটাই অনিলা তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে।

এই পল্লীরই এক নিভৃত কন্দরে বন্ধ থাকিয়া অনিলার

প্রতিদিনের জীবন দুঃসহ অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠে। যে কথা অবলীলায় শৈলমণি তাহাকে বলিয়া গেছে তাহাই ইষ্টমন্ত্রের মতো অহরহ তাহার কানে বাজিতে থাকে। ছোট ছেলেটিকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে; এমন করিয়াই মানুষ করিতে হইবে যে একদিন তাহার সন্তান ইহাদের সকলের মাথা ছাড়াইয়া উঠে। কিন্তু অনিলার স্তিমিত উৎসাহে জোয়ারের বেগ আর আসিতে চায় না। তাহার অবরুদ্ধ অন্ধকার গৃহকোণে যে আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে তাহাকেই অনুসরণ করিয়া তাহার কারারুদ্ধ আত্মা বৃহৎ জগতের আলোয় বাহির হইয়া মুক্তির আনন্দ অঞ্জলী ভরিয়া পান করিতে ছুটিয়া যায়। এই কথাটি আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, শৈলমণি চিরদিনের জন্য তাহার ভিতরে একটা অশান্তির কাঁটা বিঁধিয়া রাখিয়া গেছে।

সেদিন কি একটা সামান্য কারণ লইয়া তারাপদর সহিত তাহার বিবাদ বাধিল। কর্কশ কণ্ঠে ও কটু ভাষায় যে স্পষ্ট কথা স্বামী তাহাকে শুনাইয়া দিল তাহাতে অপমানে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। মনে হইল, হায় রে, ওই লোকটাই তাহার স্বামী! ওই লোকটা স্বামী হইয়া তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে পদদলিত করিয়া নষ্ট করিয়াছে, অথচ উহার হাত এড়াইবার উপায় তাহার নাই, উহাকেই রাঁধিয়া খাওয়াইতে হয়, সেবা করিতে হয়, উহারই কুৎসিত লালসার কাছে সে দেহ বিকাইয়া দেয়!

অগ্নিদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ছাদের উপর চলিয়া গেল। এ কথা কাহাকে সে আজ বুঝাইয়া বলিবে, ওই লোকটাকে একদিনের জন্যও সে ভালবাসিতে পারে নাই? তাহাদের সম্বন্ধ শুধু বোঝাপড়ার, শুধু প্রভু ও ভৃত্যের, তাহাদের সম্পর্ক শুধু একই ঘরে পাশাপাশি শুইয়া থাকার! মনটা তাহার গ্লানিতে আবিল হইয়া উঠিল। একজনকে আজ তাহার বড় দরকার, যে তাহাকে এই লোকটার হাত হইতে অবারিত ও অনন্ত মুক্তি দিতে পারে, যে তাহাকে দিবে উজ্জ্বল জীবন, অনাস্বাদিত আনন্দ, অপরিমেয় আত্মশক্তি। এমন একজনকে আজ প্রয়োজন, যে তাহার কানে কানে বলিবে, বাঁচিয়া থাকার একটি সুদূর সার্থকতা আছেই আছে!

কিন্তু সেখানে তাহার বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা হইল না, সিঁড়ি দিয়া দুম্‌দাম্‌ করিয়া তারাপদ উপরে উঠিয়া আসিল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, 'এখানে কেন? ভাবচ আমাকে এ[illegible]? যাও নীচে যাও, পাঁচিলের ধারে বাহার দিয়ে দাঁড়ানো [illegible]ব না, যাও।'

উপায় নাই, নিরুপায়। নিরুপায় এবং পরাধীন। এখনই হয় ত গোঁয়ারের মতো কি করিয়া বসিবে তাহার ঠিক নাই। ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অনিলা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। চোখে তখন তাহার জলের ফোঁটা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু কাঁদিলে ত চলিবে না, এখনই তাহাকে উন্থন ধরাইয়া রান্না চড়াইতে হইবে, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে!

*

* * *

গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা যায়—একটি একটি করিয়া ঋতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া পার হইয়া যায়। যাহারা ছিল তাহাদের নাম কাহারও মনে আসে না, এবং যাহারা নাই তাহাদের কথা সকলেই ভুলিয়া গেছে।

সূর্য্য আলোক বিকীর্ণ করে, রাত্রে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আকাশে উঠে তারা, গাছে ফুটে ফুল—কিন্তু তাহাদের কি? মাটির নীচে যাহারা জালে জড়াইয়া চোখ বুজিয়া থাকে, উপরের পৃথিবীর সংবাদ তাহারা রাখিবে কেন? সুন্দরকে ভুলিয়া থাকা তাহাদের স্বভাব! তাহারা নিম্ন মধ্যবিত্ত।

গলির এ-মোড়ে দামিনীর ঘর খালি পড়িয়া থাকে, গলির ও-মোড়ে বীণার ঘরে কেউ প্রবেশ করে না। এ-জানালাটি তাকাইয়া থাকে ও-জানালাটির দিকে। এ করিয়াছে সুন্দর জীবনের তপস্যা, ও করিয়াছে আত্মহত্যার দিন গণনা!

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা